পক্ষে অতি সামান্য, তুচ্ছ ও বিরক্তিজনক বোধ হইবে, হয়ত ভদ্রবালারা উহা হেয় কাজ ভাবিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রতিদিন মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল সামান্য কর্ত্তব্য পালনের দ্বারাই অনেক মহচ্চরিত্র লোকের উৎপত্তি হইয়াছে; আর উহাই ভবিষ্যতে আরো কত মহাজীবন নির্ম্মাণের প্রধান হেতু হইবে। আমাদের সম্মুখ দিয়া এমন কত পূজনীয়া জননী চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের অবস্থান সংসারে সূর্য্যকিরণের ন্যায় সর্ব্ব স্থান আলোকময় করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যাঁহাদের স্মৃতি বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের সন্তানসকলের অন্তরে দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা যে কোন অসাধারণ গুণের বলে বা অলৌকিক সাধনার দ্বারা ওরূপ দেবীর পদ পাইয়াছিলেন, তাহা নহে। কেবল একান্তমনে, সযত্নে ও সানন্দচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিয়া—রোগীর সেবা করিয়া, তৃষিতকে জলদান করিয়া, ব্যথিতকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, দুঃখীর চক্ষের জল মুছাইয়া, পরিবারের ভাত রাঁধিয়া, সন্তানদিগকে ক-খ শিখাইয়াই—তাঁহারা সংসারে মান্য ও পূজা পাইয়াছিলেন।

কার্য্যশেষে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় আমরা কোন্ অস্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম সাধন করিয়াছি, তাহা আমাদের স্মরণ করিবার প্রয়োজন নাই। উহা কলমই হউক, ছুঁচই হউক, আর ঝাঁঝাই হউক—উহা দ্বারা যদি আমরা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট নিয়োগে যথেষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কেবল ঐ সকল কর্ত্তব্য সাধনের পথ দিয়াই আমরা মহৎ লোকদিগের কাজে যাইবার আশা করিতে পারি। স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম লোকে তুচ্ছ বলিয়া ভাবিলেও উহা সামান্য কার্য্য নহে। অন্যান্য প্রকাশ্য কার্য্যের ন্যায় এই গুপ্ত কর্ত্তব্যও নিয়ম মত পালন করিতে আমাদের অনেক বুদ্ধি, জ্ঞান, শিক্ষা, সাহস, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। উহাতে প্রচুর সুখ-শান্তি, আনন্দ-উল্লাস নিহিত আছে। এ সংসারে প্রকৃতরূপে চলিতে জানিলে নিজ নিজ গৃহেই আমরা স্বর্গের সাক্ষাৎ পাই, উন্নত মানবচরিত্রে আমরা কাল্পনিক দেবতার চিত্র দেখি, এবং পিতা মাতা ও স্বামী সন্তানের মুখে ঈশ্বরের ছায়া দেখিতে পাই।

লোকে কথায় বলে 'স্ত্রীলোক পুরুষকে যেরূপ গঠন করে, তাহারা তেমনি হয়।' এ কথাটি সত্য কথা। আমাদের এই বদ্ধ জীবনেও আমরা সচরাচর পুরুষের মনের উপর স্ত্রীলোকের মহাপ্রভাব দেখিয়া থাকি। কত স্নেহময়ী মার উপদেশে অসৎ ছেলেরা সৎ হয়, কত গুণবতী স্ত্রীর অনুনয়ে অধার্ম্মিক স্বামীরা ধর্ম্মপথে আসে। কত পবিত্র মাতার দৃষ্টান্তে সৎপথভ্রষ্ট সন্তান বিশুদ্ধ হয়, কত আনন্দময়ী

ভগিনীকে দেখিয়া দুষ্ট ভ্রাতা শিষ্ট হয়। আবার কত পবিত্রা,সতী শিক্ষিতা স্ত্রীর সহবাসে পাষণ্ড পতি কোমল হয়। এমন মহৎ কার্য্য যে স্ত্রীজীবনের উদ্দেশ্য, এমন উচ্চ পদে যে নারী অধিষ্ঠিত, সে রমণীজাতির কাজ কি সামান্য? আমাদের জীবন কি অকিঞ্চিৎকর? না, না, তাহা কখনই নহে। ঈশ্বর আসিয়িক, ইউরোপীয়, হিন্দু,মুসলমান,খৃষ্টান,বাঙ্গালী ইংরাজ,সকল স্ত্রীলোককেই এক ছাঁচে গড়িয়াছেন, এক শোণিতে পুরিয়াছেন; তবে এতদিন আমরা কেবল নির্দ্দিষ্ট কাজের অভাবে এরূপ ভিন্ন বলিয়া পরিচিত রহিয়াছি। কিন্তু আর না; ভগিনী সব! এস, নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া রমণী-নামের সার্থকতা সাধন করি।

থাকিতে বাসনা যদি আনন্দের মাঝে,
সতত ঘুরগো তবে কর্ত্তব্যের কাজে।
এ ব্যস্ত সংসার ছেড়ে বিরলে নিবাস—
নহে সে শান্তিতে কভু মানবের আশ।
নদীর গতির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
অথচ চাহে না উহা ঝটিকার বল।
ধীর কিন্তু দ্রুতপদে সাগরে নামিবে—
জগতের কার্য্যশেষে অনন্তে মিশিবে।
ভালবাসা, পরিচর্য্যা, পরিশ্রমবলে,
উৰ্দ্ধেতে উঠিবে উহা থেকে ধরাতলে।
অসীম কাজের মাঝে স্বর্গপানে চাবে,
সেই সে জীবন সত্য এ বিপুল ভবে।

ডাক টিকিট।

ডাক টিকিট প্রবাসীর পক্ষে বহু উপকারী ও প্রয়োজনীয়। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলের পক্ষেই সমান। জীবনের সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহাও প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়। সামান্য আয় সত্ত্বেও লোকে ডাক টিকিটের জন্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব ইহার ইতিহাস জানা উচিত। একটী সামান্য ঘটনা দ্বারা জগতে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০শে জানুয়ারী হইতে লণ্ডনে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণিতে ইহার প্রচার আরম্ভ হয়। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ইংলণ্ডের এক পান্থনিবাসে একটী যুবতী চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে উক্ত আবাসদ্বারে যেন কাহার অপেক্ষায় আসা যাওয়া করিতেছিল। উহার স্নেহপূর্ণ নয়ন দুটী সতৃষ্ণভাবে কাহার পথ চাহিয়াছিল।

অপেক্ষিত সময় অতি দীর্ঘ হয়, মানুষ পলে পলে তাহার গুরুত্ব অনুভব করে। যুবতীর ভ্রাতা বহুদিন হইল প্রবাসে গিয়াছে, আবাল্যসঞ্চিত সৌভ্রাত্রস্নেহে অন্তরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ, তাই আজ ব্যাকুলহৃদয়ে বিদেশস্থিত সোদরের কুশলবার্ত্তাবাহী লিপিখণ্ডের আশায় ঘর

বাহির করিতেছে। ইত্যবসরে দ্বারে কে আঘাত করিল। যুবতী প্রার্থিত বস্তুর আশায় ছুটিয়া বাহির হইল। সম্মুখে দেখে ডাকাপিয়ন পত্রহস্তে দণ্ডায়মান। যুবতী পুলকিত চিত্তে পত্রখানি চাহিল।

ইহার মাশুল এক শিলিং দিতে হইবে, ডাকপিয়ন কহিল।

যুবতার আনন্দবিস্ফারিত নেত্র, উৎফুল্ল হৃদয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। হায়! আজ ত এক শিলিং নাই, তবে আর দাদার পত্র রাখিতে পারিলাম না নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া চলিল।

ঘটনাস্থলে উক্ত পান্থনিবাসে আর একটী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার নাম রোলণ্ড হিল। তিনি এক শিলিং মাশুল দিয়া ডাকপিয়নের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া যুবতীকে দিলেন। যুবতী বিনম্রহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া পত্রখানি ওলট পালট করিয়া বারম্বার দেখিয়া কহিল, ইহার বাহিরের অঙ্কিত চিহ্নেই আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিয়া লইলাম। ভিতরে আর কিছুই লেখা হয় নাই, পাছে মাশুল বেশী লাগে।"

রোলণ্ড হিল নিজ গন্তব্য স্থানে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, এ যুক্তি মন্দ নয়, এরূপ প্রতারণায় পাপ নাই। আচ্ছা, তবে যে দেশে ব্যবসায় বাণিজ্য এত অধিক এবং যে দেশের লোকেরা নানা কার্য্যোপলক্ষে আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতার বন্ধন কাটাইয়া প্রবাসে যায়,তথায় যদি এই উপায়ে পত্রের মাশুল কমাইয়া দেওয়া যায়,তবে লোকের কত উপকার হয়। এবং সরকারকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

তাঁহার এ উদ্দেশ্য সফল হইল। উক্ত চিত্রাঙ্কনানুযায়ী পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প গবর্ণমেন্টের আইনমত উল্লিখিত সময় হইতে প্রচলিত হইল। সমুদয় বৃটীশ আইল্যাণ্ডে এক পেনি মাশুলে কথিত পরিমাণের পত্র যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই শুভ সংবাদ অচিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং দশ বৎসরের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের পোষ্ট্যাল বিভাগের আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি হইল। রোল্যাণ্ড হিল ইংলণ্ডের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের সেক্রেটারী হইলেন।

এই ক্ষমতা ও কৌশল পরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় সভ্য দেশে গৃহীত হইল।

শ্রী "মনোজবা"-রচয়িত্রী।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়।

অতএব দেখা যায় যে, পুরুষ শিক্ষকাপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর অধিক প্রয়োজন। কেবল অবরোধপ্রথা আছে বলিয়া যে শিক্ষয়িত্রী অধিক বাঞ্ছনীয়, এরূপ

নহে। বোধ হয় রমণীদের অভাব ও প্রকৃতি রমণীরা ভালরূপে বুঝিতে পারেন ও অন্যান্য বিষয়েও অনেক সুবিধা হয়। এরূপ বিদ্যালয় আবশ্যক, যেখানে পুরুষ শিক্ষকের নাম গন্ধও নাই ও বিদ্যালয়ে বোর্ডিং থাকাও প্রয়োজনীয়। ঐরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ও তত্ত্বাবধায়িকা থাকিলে অন্তঃপুরাবরুদ্ধা রমণীদেরও তথায় পাঠ করা ও অবস্থান করা সম্ভব হইতে পারে। এরূপ বিদ্যালয়ের জন্য সচ্চরিত্রা সুশিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক ও তাঁহাদিগকে অল্প বেতনের পরিবর্ত্তে অধিক বেতন দিয়াও নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ঐরূপ কতকগুলি উচ্চশিক্ষাপ্রদ বিদ্যালয় থাকিবে ও তথায় বিজ্ঞানাদি উচ্চ শিক্ষাভিলাষিণী রমণীগণ অধিক বেতন দিয়া পাঠ করিবেন ও যাঁহারা অধিক বেতন দিয়া পড়িতে অসমর্থা, তাঁহারা বুদ্ধিমতী হইলে ও বৃত্তি পাইলে অবস্থানুসারে বেতন না দিয়া বা অল্প বেতন দিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। ঐরূপ বিদ্যালয় ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা সুলভ ও সামান্য ভাবে বিতরণের জন্য কতকগুলি বিদ্যালয় থাকা আবশ্যক। কিন্তু ঐরূপ বিদ্যালয় দ্বারা অধিকসংখ্যক অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। ব্রাহ্ম বালিকা ও বেথুন ইত্যাদি দুই একটী রমণীবিদ্যালয়ে কতকগুলি স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী থাকিলে চলিবে না আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি সর্ব্বস্থানেই সুশিক্ষয়িত্রী ও বিদ্যালয় থাকা প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহাতেও অনেক অন্তঃপুরবাসিনী শিক্ষালাভে বঞ্চিতা হইবেন। তজ্জন্যই ভাল ভাল সচ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক—প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী দুর্লভ ও বহুব্যয়সাপেক্ষ। ভাল শিক্ষয়িত্রী পাইলে কতকগুলি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহাদের ও অন্যের অন্তঃপুরমহিলাগণকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন। যদি তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলান না হয়, তবে দেশস্থ অনেক ধনকুবের আছেন, তাঁহারা এ বিষয় মনোযোগী হইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। সকল বিষয়ে যথাসাধ্য আত্মনির্ভর করা ভাল, সহসা রাজপুরুষদিগের সাহায্য ভিক্ষা করা ভাল বোধ না, তবে তাঁহারা সাহায্য করেন ভালই। কিন্তু আমার বোধ হয়, অন্যের সাহায্য ব্যতীত দেশীয় ধনিগণ যে অর্থ ব্যসনাদিতে ব্যয় করেন, উহার কিয়দংশ অন্তঃপুর মহিলাদের স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয়িত হইলে সমূহ কল্যাণ হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই—স্ত্রীশিক্ষা বিতরণের জন্য কাহারা শিক্ষয়িত্রী হইবেন? এ ব্রতে হিন্দু মহিলারা যোগ দিবেন না—দিলে ত লক্ষ লক্ষ বিধবা শোকের ডালি মস্তকে বহন করিয়া জীবন কাটাইতেছেন, তাঁহারা নিজ ভগ্নীদের উপকার করিতে যত্নবতী হইলে ভাবনা কি? কিন্তু তাঁহারা অগ্রসর হইবেন না। তবে যদি ব্রাহ্ম মহিলাদিগকে

প্রথমতঃ শিক্ষা দ্বারা উপযুক্তা করিয়া এই সর্ব্বজনহিতব্রতে নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তবে সমাজের সমূহ মঙ্গল অচিরাৎ সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপে কোনও প্রকারে মহিলারা একবার জ্ঞানের আস্বাদন পাইলে নিশ্চেষ্টা থাকিবেন না।

অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা বিতরণের জন্য এদেশে যে সকল খৃষ্টীয়া মিশনরী নারী আছেন, তাঁহারা অনেক উপকার করিতেছেন স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের নিকট হইতে অধিক কিছু আশা করা যায় না।

আধুনিক ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত, ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্থল দেশীয় যুবকমণ্ডলীর প্রশংসনীয় চেষ্টায় অনেক স্থানে স্ত্রীশিক্ষা-বিতরণের জন্য সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইঁহারা পরীক্ষা গ্রহণান্তর পুরস্কার প্রদান ও বৃত্তি স্থাপন দ্বারা ও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অন্তঃপুর বাসিনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব ও পুরস্কার লাভের ইচ্ছা প্রবল করিয়া দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতেছেন। যাঁহারা বিদ্যালয়ে যাইবেন না, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষিতা হইতে চাহেন ও নিজের নিজের নাম ধামাদি ও তত্ত্বাবধায়কের বা অভিভাবকের নামাদি সমিতির নিকট লিখিয়া পাঠান। সমিতি হইতে রমণীদিগের নিকট প্রশ্ন প্রেরিত হয় ও পরীক্ষানন্তর বৃত্তি বা পুরস্কার যোগ্যতানুসারে প্রদত্ত হয়। এ সকল ব্যতীত আরও একটী উপায় আছে। আজ কাল ভদ্রসমাজে বিবাহে "জামাতা ঠাকুর"কে অনেক অর্থ দিতে হয়, কিন্তু অর্থের পরিবর্ত্তে জামাই বাবুরা যদি বালিকাদের শিক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেন ও ঐ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন তবে কন্যাকর্ত্তা বা বালিকাদের অভিভাবকেরা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন, ইহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। লোকে অন্য কারণে অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে শিক্ষা দিতে না চাহিলেও অন্ততঃ বিবাহ দেওয়া দুর্ঘট ভাবিয়াও তাঁহাদের শিক্ষার বিষয় অমনোযোগী থাকিতে পারিবেন না।

অঞ্জলি।

(১)

বিশ্বনাথ!
অনন্তের এককোণে
আমি ক্ষুদ্র রেণুকণা,
কি বুঝিব মূঢ় আমি
তোমার করুণাকণা।

(২)

তোমার নিখিল বিশ্ব

স্বষ্টির কৌশল তব,
তাহাতে তোমার স্নেহ
হেরি নিত্য অভিনব।

(৩)

তোমার মহিমা-বলে
প্রভাতে তরুণ রবি,
সুনীল গগনে হাসে
ছড়া'য়ে কনক ছবি।

(৪)

নিশীথে কিরণ ঢালে
কাহার আদেশে শশী,
সে আলোকে মাথা যেন
তোমার করুণারাশি।

(৫)

তারাগুলি ফুটে উঠে
অনন্ত গগন গায়,
ছড়ায়ে কিরণকণা
তোমার মহিমা গায়।

(৬)

কোকিলের কুহুস্বরে
পাপিয়ার মৃদু গানে,
তোমার স্নেহের কথা
নীরবে জাগায় প্রাণে।

(৭)

তটিনীর ভরা বুকে
কুলু কুলু কুলু তান ;
তারি মাঝে শুনা যায়
তোমার মহিমা-গান।

(৮)

বসন্ত হেমন্ত আদি
ছয় ঋতু কত বার,
তোমার করুণা বলে
আসে যায় বার বার।

(৯)

প্রকৃতির ভরা বুকে
দিয়াছ মাধুরী কত !
শ্যামল কুন্তল তার
সাজায়েছ ফুলে শত।

(১০)

অবোধ সন্তান মোরা
তোমার মহিমা-বলে,
কখনও হরষে হাসি,
কভু ভাসি আঁখিজলে।

(১১)

তুমি আছ তাই আছি
তুমি ছাড়া আমি নাই,
যখন ভাঙ্গিবে খেলা
চরণেতে দিবে ঠাই।

(১২)

তুলিয়াছি এই প্রভু !
ভকতি কুসুমরাজি,
ঢালিব বলিয়া নাথ !
তোমার চরণে আজি।

(১৩)

অধম সন্তান ব'লে
চরণের ধূলিকণা
অন্তিমে শিরেতে দিতে
যেন প্রভু ভুলিওনা।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।
রাজসাহী।

প্রাচীন আর্য্য নারীদিগের সম্মান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পিতা হইতে দেহ লাভ হয়, আচার্য্য বা অধ্যাপক হইতে সেই দেহে জ্ঞান লাভ হয়; অতএব আচার্য্য বা অধ্যাপক পিতৃ-তুল্য বলিয়া তৎপত্নীও মাতৃতুল্যা। যাঁহার রাজ্যে বাস করা যায়, সেই রাজা প্রজা-দিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করেন। রাজ্যের সকল পদার্থই রাজার; ধরিতে গেলে রাজার স্নেহে ও রাজার অন্নেই প্রতিপালিত হওয়া যায়, অতএব রাজা পিতৃতুল্য বলিয়া তৎপত্নীও মাতৃতুল্যা। মাতা যেমন খাদ্য দান করিয়া সন্তানকে প্রতিপালন করেন, তেমনি যে স্ত্রীলোক অন্নদান করিয়া প্রাণ বাঁচান, তিনিও মাতৃতুল্যা। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দান করেন বলিয়া গুরু এবং পুত্রের ন্যায় সকল জাতিকে স্নেহ করেন বলিয়া পিতা, এই জন্য ব্রাহ্মণপত্নীগণও মাতৃতুল্যা পূজনীয়া। যাহাকে দারা হইতে ভিন্নরূপে দেখিতে হয়, এরূপ স্ত্রী অর্থাৎ পরপত্নীও মাতৃতুল্যা। যাহাদিগকে স্নেহের চক্ষুতে দেখিতে হয় এবং ভালবাসিয়া মা বলিয়া ডাকা যায়, তাহারাও মাতৃতুল্যা। গাভী পশুজাতি হইলেও তাহাকে এক প্রকার মাতা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। যেমন মাতৃ-স্তন্যে প্রতিপালিত হওয়া যায়, তেমনি শিশুকালে এবং তৎপরেও গাভীর দুগ্ধে প্রতিপালিত হওয়া যায় বলিয়া গাভীও এক প্রকার মাতা। ধরিত্রীকেও আমা-দের শাস্ত্রে এক প্রকার মাতা বলে। মাতা যেমন ক্রোড়স্থিত শিশুর সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেন, তেমনি ধরিত্রী দেবীর (ক্রোড়ে) উপরে থাকিয়া আমরা যে যে দোষ করি, তাহা তিনি সহ্য করেন, এই জন্য ধরিত্রীর আর একটী নাম সর্ব্বংসহা। যেমন মাতার বক্ষঃস্থিত স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া আমরা শিশুকালে প্রতিপালিত হই, তেমনি পৃথিবীর উপরে (বক্ষে) উৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণে আমরা প্রতিপালিত হই, এ কারণেও পৃথ্বী মাতৃতুল্যা। জননীতে পৃথিবীর ধর্ম্ম আছে বলিয়া সংহিতাকার মনু, মাতাকেও পৃথিবীর মূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উল্লিখিত প্রকারে মাতৃধর্ম্ম আছে বলিয়া আমাদের পুরাণশাস্ত্রসমূহের কোন কোন স্থানে সপ্ত মাতা, কোন কোন স্থানিতে নব মাতা ও কোন কোন স্থানিতে ষোড়শ মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

আদৌ মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজ-
পত্নীকা।
গাবো ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ
স্মৃতাঃ॥

পদ্মপুরাণম্।

অনুবাদ। জননী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী,

রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী ও পৃথিবী এই সাত জন মাতা বলিয়া কথিতা হন।

জননী গুরুপত্নী চ জ্যেষ্ঠসোদরপত্নীকা।
শ্বশ্রূর্জ্যেষ্ঠা সোদরা চ পিতৃব্যাস্ত্রীচ মাতুলী।
মাতুঃ পিতুঃ স্বসা চৈব নবেমা মাতরঃ
স্মৃতাঃ।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্।

অনুবাদ। জননী, গুরুপত্নী, জ্যেষ্ঠ-সহোদর-পত্নী, শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পিতৃব্যস্ত্রী, মাতুলানী, মাতৃষ্বসা ও পিতৃষ্বসা ইহাঁরা নয়জন মাতা বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন।

স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া।
অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকা॥
সগর্ভজা যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ।
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা।
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈবচ॥
জনানাং বেদবিহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অনুবাদ। স্তনদাত্রী, গর্ভধারিণী, ভক্ষ্যদাত্রী, আচার্য্যাণী, অভীষ্টদেবপত্নী (মন্ত্রদাতা গুরুর পত্নী), বিমাতা, বৈমাত্রেয়া ভগিনী, সহোদরা ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা, মাতামহী, পিতামহী, সহোদর-ভ্রাতৃবধূ, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা ও মাতুলানী ইহাঁরা ষোলজন মনুষ্যদিগের বেদবিহিতা মাতা বলিয়া স্মৃতা হইয়া থাকেন।

প্রাচীনকালে আর্য্যদিগের নিকটে যেমন পুজনীয়া মহিলামাত্রই মাতার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তেমনি স্নেহাস্পদ আত্মীয়া স্ত্রীলোকমাত্রই কন্যার ন্যায় স্নেহ ও আদর লাভ করিতেন। কন্যার সহিত বিশেষ এই যে, কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত পালন করিয়া উত্তম পাত্রসাৎ করিলেই হইত, আর কন্যাতুল্য স্নেহভাজন পুত্রবধূ প্রভৃতিকে চিরকাল সস্নেহে পালন ও সৎশিক্ষা দান দ্বারা সমাদর করিতে হইত।

গৃহদীপ্ত বা শোভান্বিত করে বলিয়া প্রত্যেক গৃহে কন্যা এক অতুলনীয় স্বর্গীয় পদার্থ। কন্যাগণ মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে নন্দিনী কহে। মাতা পিতা হইতে পুত্র ও কন্যা উভয়েই জন্মলাভ করে। এই জন্য শাস্ত্রানুসারে পুত্রকে যেমন পালন ও শিক্ষাদান করিতে হয়, তেমনি কন্যাকেও পালন ও শিক্ষাদান করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, পূর্ণ সাত বৎসর হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার কাল। কিন্তু এই নিয়মটী অনিয়ত অর্থাৎ সর্ব্বত্র ঘটে না। যদি উপযুক্ত বর পাওয়া যায় তবে বিবাহকাল উপস্থিত না হইলেও কন্যার বিবাহ দিবে। পক্ষান্তরে উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় যদি কন্যার বিবাহের উপযুক্ত কাল অতিক্রম হইয়া যায়, তবে তাহাও বিশেষ দোষ বিবেচনা করিবে না। পণ গ্রহণ করিয়া অসৎ পাত্রে কন্যার বিবাহ দিলে, পিতা যেমন চিরকাল কন্যার কষ্টের কারণ হন, তেমনি লোকসমাজেও নিন্দিত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হন। পর লোকেও কন্যাবিক্রয়ীর

অশেষ যন্ত্রণাকর নরকভোগ হয় বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। যে বর বিদ্বান্, মহেশ্বরভক্ত, সুশীল, সঙ্গতিপন্ন, সদ্বংশজাত, বলবান্ ও দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধি-হীন, তাহারই সহিত উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া পিতার কর্ত্তব্য সুপালন করিবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে মাতা অনেক প্রকার, তেমনি কন্যাও অনেক প্রকার। ইঁহাদিগকে কোন প্রকারেই কন্যা অপেক্ষা অল্প স্নেহ করিবে না। নিম্নে যে কয়েক প্রকার কন্যার নাম দেওয়া যাইতেছে, ইহাদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে।

পুত্রী, কনিষ্ঠসোদর্য্যা, পুত্রভার্য্যা তথৈবচ।
কনিষ্ঠসোদরস্ত্রীচ শিষ্যা পুত্রবধূস্তথা ॥
ভাতুষ্পুত্রী ভাগিনেয়ী নবমী শরণাগতা।
সুতা পর্য্যায়কাস্ত্বেতাঃ স্নেহশাসনভাজনম্॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্॥

অনুবাদ। দুহিতা, কনিষ্ঠা সহোদরা, পুত্রবধূ, কনিষ্ঠ-সহোদর পত্নী, শিষ্যা, পুত্র-তুল্য স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃপুত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতির স্ত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী ও শরণাগতা নারী, এই নয়জন কন্যামধ্যে গণ্যা। ইহাদিগকে স্নেহ ও শাসন করিবে।

মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে লিখিত আছে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য, কারণ পিতৃ-বিয়োগ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই তাহাকে লালন পালন ও শিক্ষাদান করেন। অতএব কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রবধূর ন্যায় স্নেহ করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে মাতার ন্যায় সম্মান করিবে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীও মাতৃতুল্যা, কারণ কখন কখন এরূপ ঘটে যে শিশু ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্তন পান করে।

এইরূপেই আর্য্যগণ পুরাকালে কোনও কোনও মহিলাকে মাতার ন্যায় সম্মান ও কোন কোন মহিলাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া নারীজাতির প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে আরও নির্দ্দেশ আছে, পরিবারস্থ পূজনীয়া স্ত্রীবর্গ, ভার্য্যা, কন্যা, কুলবধূগণ, ও পরিচারিকাগণ ইহাদিগের কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইলেও তাহা সহ্য করিবে। ইহা-দিগের সহিত কলহ করিয়া পরস্পরের সম্মান নষ্ট করিবে না। অথবা তিরস্কার করিয়াও মনে কষ্ট দিবে না। সদুপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হিত ও প্রীতিসাধন করিবে।

প্রাচীন ভারতে গৃহিণীগণ গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গৃহস্থের শরীরার্দ্ধভাগিনী ও সহধর্ম্মচারিণীরূপে সম্মানিতা হইতেন। গৃহিণীর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ভিন্ন গৃহধর্ম্ম রক্ষা হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারগণ গৃহিণীকেই গৃহ বলেন। স্ত্রীপর্য্যায়বাচক শব্দ-গুলির ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ পর্য্যালোচনা করিলেও গৃহস্থাশ্রমে গৃহিণীর উপযোগিত্ব ও সম্মানভাজনত্ব বুঝিতে পারা যায়। যিনি গৃহদোষ আবরণ করেন, তাঁহাকে স্ত্রী কহে (স্তৃ + কর্ত্তৃবাচ্য ড্ট্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্),

অর্থাৎ যে থাকাতে গৃহ, বিশৃঙ্খলতাদোষ পরিশূন্য হইয়া শোভমান হয়; তাহাকে স্ত্রী কহে। যাহাকে মহ বা পূজা করিতে হয় তাহাকে মহিলা কহে। (মহ্+কর্ম্ম-বাচ্যে কিরপ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) অর্থাৎ বসন ভূষণাদি প্রীতিকর বস্তু, প্রিয় ব্যবহার ও প্রিয় বচনে তুষ্ট করিতে হয় বলিয়া স্ত্রীদিগকে মহিলা কহে। বিধিক্রমে বিবাহিতা স্ত্রীর কয়েকটী পর্য্যায় শব্দের মধ্যে একটীর নাম দ্বিতীয়া। স্ত্রী না থাকিলে গৃহস্থের অন্য সহকারিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া কেহ গৃহস্থধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতে পারে না বলিয়া, গৃহস্থ ধর্ম্মে গৃহী নিজে প্রথম, পরে স্ত্রীই দ্বিতীয়া।

গৃহস্থ যদ্দ্বারা আদৃত হয়, তাহাকে দার কহে (দৃ+করণবাচ্য ঘঞ্)। কুলস্ত্রীর অন্য নাম কুলপালিকা। যিনি বংশের অকীর্ত্তিকর দোষসমূহকে ঘৃণা সহকারে পরিবর্জ্জন করিয়া কুল পালন করেন, তাহাকে কুলপালিকা কহে। পুত্রাদি-যুক্তা গৃহস্থিতা স্ত্রীকে পুরন্ধ্রী কহে। পুরন্ধ্রী (পুর+ধৃ+কর্ত্তৃবাচ্যে খ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্) এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ এই যে পুর বা গৃহ যিনি ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি থাকাতে গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীবাচক অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ অনুসন্ধান করিলেও প্রমাণ পাওয়া যাইবে, প্রকৃতভাবে গৃহ-লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন বলিয়া, পতির মনোরঞ্জন করেন বলিয়া, গৃহস্থের ধর্ম্ম কর্ম্মে সহকারিণী হন বলিয়া স্ত্রী অত্যন্ত সম্মানার্হা।

পুরাকালে ধর্ম্মাচরণে সহকারিণী করি-বার জন্য একমাত্র পত্নীই গ্রহনীয়া ছিল। যদিও কেহ একাধিক বিবাহ করিত, তাহারা যে নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত না তাহা নহে। প্রথম বিবাহের পত্নী ধর্ম্মপত্নী নামে এবং অবশিষ্ট পত্নীগণ কামপত্নী নামে সাধারণতঃ অভিহিতা হইতেন। নরপতিগণ যে স্ত্রীর সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইতেন, তাহাকে রাজ-মহিষী বা মহিষী বলা হইত, এবং তদ্ভিন্ন অন্য স্ত্রীদিগকে ভোগিনী বলা হইত। মহিষী শব্দের অর্থ মহিষের বা অভিষিক্ত রাজার স্ত্রী, অথবা অভিষেক কালে রাজার সহিত যাহাকে মহ বা পুজা করা হয়।

ভূত না মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদের সূত্রপাত।

রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। সুস্নিগ্ধ, সুবা-সিত সমীর-প্রবাহে ও কনকশুভ্র সুধাময় সুধাকর-কিরণে সমস্ত পুরমণ্ডল গ্রামখানি ঝলসিতেছিল। শ্যামল দূর্ব্বাদলের শিরো-ভাগে পূর্ণচন্দ্রের রজত কিরণ সম্পাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুনিচয় মুক্তামালার

ন্যায় ঝলমল করিতেছিল। আবার আকাশের অপর প্রান্তে ঘনীভূত মেঘমালা সজ্জিত হইয়া একরূপ বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিয়া গগনখানিকে অপূর্ব্ব চিত্রপট করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় একজন হতভাগ্য রুগ্ন ব্যক্তি ভগ্ন পালঙ্কে শয়ন করিয়া ছটফট করিতেছিলেন। এই ব্যক্তির বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু জরা-রোগ্য ব্যাধি তাহাকে বার্দ্ধক্যদশায় লইয়া উপস্থিত করিয়াছে। শরীরে পূর্ব্বের রূপ লাবণ্যের চিহ্নমাত্র নাই। পূর্ব্বে একদিন এই ব্যক্তি সদাশয় এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া সকলের মাননীয় ও অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহৎ মহান্ মহাশক্তিমান ভগবানের লীলাক্ষেত্র। এ অনন্ত লীলা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। সেই মহৎ ব্যক্তি আজ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অতি হেয় ব্যক্তিরও হেলনীয়। যখন তাঁহার রূপ ছিল, গুণ ছিল, ধন ছিল, মান ছিল, গৌরব ছিল, বল ছিল, যৌবন ছিল, তখন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, ভাল বাসিত, কিন্তু আজ ইনি আপন অদৃষ্টদোষে চিররুগ্ন ও মহাদরিদ্র। তাঁহার সম্মুখে একটি রমণীরত্ন বসিয়াছিলেন, রমণী যুবতী ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। কিন্তু এই সুন্দরী রমণীর সুন্দর দেহ অনাহারে, অল্পাহারে ও দুশ্চিন্তায় কিঞ্চিৎ ম্লান অনুভূত হইতেছে। বসন্তপ্রকৃতির অঙ্গে সন্ধ্যাবরণের ন্যায় এই বরবর্ণিনী রমণীর সমস্ত দেহ ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে; এবং তৎকালে তাঁহার মলিন অঞ্চল ঝঞ্ঝালুণ্ঠিত লতাটীর ন্যায় ভূমে পড়িয়া লুটিতেছিল। বায়ুতাড়িত মেঘমালার ন্যায় নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠে, গালে, চোখে, মুখে পতিত হইয়া দ্বিগুণ শোভা বর্দ্ধণ করিতেছিল, রমণীর নাম প্রতিধ্বনি। এই রুগ্ন ব্যক্তিই প্রতিধ্বনির স্বামী, নাম দেবদত্ত।

দেবদত্ত চক্ষু বুজিয়া শুইয়া ছিলেন, প্রতিধ্বনি নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস দিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ডাকিলেন "প্রতিধ্বনি! প্রতি!" প্রতিধ্বনি উত্তরে কহিলেন,—"ঘুমাও নাই? তবে এখন ঔষধটা খাও।"

"না, আর ঔষধ খাইব না" বলিয়া দেবদত্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কহিলেন,—অনেক ঔষধ খাইলাম, কিছুতে কিছু হইল না, আর ঔষধ খাইব না, বাড়ীর বড় বড় ঘরগুলি বিক্রয় করিয়া, তোমার গহনাপত্র ও আর সমুদয় জিনিষ বিক্রয় করিয়া কেবল ঔষধই খাইলাম, কিন্তু আরোগ্যলাভ করিতে পারিলাম না। মরিতে বসিয়াছি, নিশ্চয়ই মরিব, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু তোমার যে কি গতি হইবে, তাহা ভাবিলে সত্যই যেন আমাকে শত শত বৃশ্চিক দংশন করে।" রুগ্নের শুষ্ক গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

"ছি, আবার ঐ কথা, আবার ঐ চিন্তা; রোগ কি কারো হয় না? তুমি

যে স্বপ্নে ঔষধটা পেয়েছিলে, সেটাতে তুমি অনেক ভাল হয়েছ, জ্বরটাও কমেছে, কাসি তো নাই বল্লেই হয়, বলিয়া প্রতিধ্বনি স্বামীকে ঔষধ পান করাইলেন।

দেবদত্ত নিজের জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন, অতএব স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এই সময় হঠাৎ অল্প অল্প বৃষ্টি ও প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। সেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির ক্ষুদ্র কুটীরের দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাত হইতে লাগিল।

"কে রে?" বলিয়া প্রতিধ্বনি বাতি উস্কাইয়া দিলেন। বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গে "দোর খোল" "দোর খোল" শব্দ শ্রুত হওয়া গেল।

একি, এ যে পুরুষের কণ্ঠস্বর! তাহাও যেন আবার অনেকগুলি লোকের মনে হইল। প্রতিধ্বনির গৃহে দুইটী লোক শয়ন করিতেন, ঘটনাক্রমে তাঁহারাও আজ উপস্থিত ছিলেন না। প্রতিধ্বনি অত্যন্ত ভীতা হইলেন, দ্বার না খুলিয়াই বলিলেন "তোমরা কে? কি চাও?

শব্দ হইল, দ্বার খোল। প্রতিধ্বনি দ্বার খুলিলেন না। স্থির হইয়া উপবিষ্ট রহিলেন ও মনে মনে মহেশ্বর মহেশ্বরী তারাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্ষুদ্র দরজা ভাঙ্গিয়া সাত জন বলিষ্ঠ পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতিধ্বনি ছিন্ন বস্ত্রে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন কিঞ্চিৎ রূক্ষস্বরে কহিলেন, "তোমরা কে? কিজন্য আসিয়াছ?" তাহারা কহিল,—আমরা চণ্ডদেবের চর, তোমাকে ধরিয়া লইতে আসিয়াছি—।

প্রতি—কেন?

আগন্তুকগণ কহিল, "তাঁহার হুকুম, জানতো তিনি কে, স্ব ইচ্ছায় যদি যাও তবে সুখী হইবে, নচেৎ জোরপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইব।

প্রতি—চণ্ডদেব সাধু বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল, এখন দেখিতেছি সাধু ত নয়ই, পাপীরও—অধম।

"মুখ সাম্‌লে কথা বল" বলিয়া ঐ সাত ব্যক্তি গর্জ্জণ করিয়া উঠিল, বলিল "যদি যেতে মন হয় তবে চল্, না হয় আমাদের কাজ আমরা করি।"

প্রতিধ্বনির হৃদয়ে আগুন জ্বলিতেছিল, চক্ষে জল ঝরিতেছিল, তিনি নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। চণ্ডদেবের অনুচরেরা কহিলেন, দেখ ভাবিয়া দেখ, এমন সুখ এমন শান্তি আর পাবে না। ঐ রোগা বেটার কাছে থেকে চিরকাল কেবল না খেয়ে না দেয়ে কেঁদে কেঁদে কাটালে, এখন একবার সুখের চেষ্টা দেখ।

প্রতিধ্বনিও তাহাদের প্রস্তাবে উপস্থিত সম্মত হওয়া ব্যতীত আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন ও শুষ্ক হাস্যরেখায় সুন্দর অধরপল্লব রঞ্জিত করিয়া কহিলেন, হাঁ আমিও তাহাই ভাবিতেছি, আর এত কাঁদিতে পারি না, আর এত

ভাবিতে বা যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না।

চরেরা কহিল বেশতো চল, চণ্ডদেবের নিকটে চল, তোমার সর্ব্ব দুঃখের অবসান তিনিই করিবেন।

প্রতি,—হাঁ তাই ভাবিতেছি, কিন্তু—

কিন্তু তাহার কথায় বাধা দিয়া চরেরা কহিল,—আবার কিন্তু, আবার কিন্তু কি? শুভ কর্ম্মে আবার দো'মনা কেন?

প্রতি—না, তা বল্‌ছি না, ভাবছি কিসে আমার ঐ রুগ্ন স্বামীটাকে কি করে যাই?

অনুচরেরা বলিল ফেলে রেখে যাও, আর বলত আমরাই একটা টিপী দিয়ে শেষ করে রেখে যাই।

কোপান্বিতা ও কম্পমানা প্রতিধ্বনির মুখ হইতে কি একটা রূঢ় কথা বাহির হইতেছিল, কিন্তু তিনি চাপিয়া কহিলেন,—"না, তাতে আর দরকার কি? কিন্তু আমার একটা ব্রত আছে, আর এক হপ্তা পরে আমাকে ব্রতটা সমাধা করিতে হবে, অতএব আমি আর এক হপ্তা কাল সময় চণ্ডদেবের নিকট যাচ্ঞা করি এবং আশা করি তিনি আমার আবেদন পূর্ণ করিবেন।

অনুচরগণ—তুমি যদি নিশ্চয়ই যাও, তবে তিনি তোমার এ প্রস্তাবে নিশ্চয়ই রাজী হবেন। তুমি যাবে তো ঠিক? গেলে কবে যাবে তাহা ঠিক্ করে বল।

প্রতি—৮।৯ দিনের সময় চাই, ৮।৯ দিন পরে তোমরা এসে আমাকে নিয়ে যেও।

"আচ্ছা, আজ হইতে ঠিক্ আট দিনের রাত্রে এমনি সময় আমরা এসে তোমাকে নিয়ে যাব" বলিয়া চণ্ডদেবের অনুচরগণ গৃহের বাহির হইয়া গেল। তৎকালে সুপ্ত সিংহের নাসিকা গর্জ্জনের ন্যায় দেবদত্ত গর্জ্জন করিতেছিলেন। প্রতিধ্বনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া নীরব হইয়া বসিলেন, তৎপরে বহুক্ষণ নিজের মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, ঝড় প্রায় নাই, কিন্তু বৃষ্টির এখনও বিরাম হয় নাই। আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘমালায় মণ্ডিত। অনন্ত দিগন্তের মধ্যে নানাবিধ পুষ্পরাজি, ঘনান্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে, বৃষ্টিজলে আগ্রীব নিমজ্জিত তরুলতা কুল অন্ধকারেও ক্রীড়া করিতেছে।

প্রতিধ্বনি চলিলেন, উত্তরদিকে বরাবর একটা পথ চলিয়া গিয়াছে—প্রতিধ্বনি সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। একজন কৃষ্ণ বেশধারী ভূত যে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছিল, তিনি তাহা কিছুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার কুঞ্চিত কেশদাম শিথিল অঞ্চল জলে ভিজিতেছিল। প্রতিধ্বনি হিন্দুর মেয়ে, তাঁহার মৃণাল-বিনিন্দিত হস্তে লোহা ও শাঁখা ছিল, সীমন্তে সিন্দুর চিহ্ন ছিল, কিন্তু তিনি ভূত বিশ্বাস করিতেন না, প্রেত বিশ্বাস করিতেন না, অতএব তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণাপরিপূর্ণ মুখকমলে ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকারবৎ

চিন্তার গাঢ়চ্ছায়া প্রকাশ পাইতেছিল। সম্পূর্ণ অনাহ্লাদজনিত ভ্রূকুটী বিকাশ হইতেছিল। তিনি চলিলেন, অনিবার্য্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চলিলেন। তাঁহার দিক্ ঠিক্ ছিল, পথ চেনা ছিল, যাইতে কোন কষ্ট হইল না। সম্মুখে একজন ধনী লোকের বাটী, অন্ধকারের মধ্যেও তিনি তাহা চিনিলেন। পাহারাওয়ালারা তখন সজাগ ছিল, প্রতিধ্বনিকে তাহারা চিনিত, অতএব সম্ভ্রমের সহিত পথ ছাড়িয়া দিল। প্রতিধ্বনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া একজন রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রমণী ব্যস্ততা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? তাঁহার অসুখ কি বৃদ্ধি পাইয়াছে?"

প্রতি—না।

রমণী—তবে কি?

প্রতি—এস, পরে জানিবে।

একজন দাসী সেখানে ছিল। সে কহিল "মা! কি ব্যাধিই তোমার স্বামীর হইয়াছে যে কোন ঔষধেই সারিতে চায় না।"

প্রতিধ্বনি তাহার উত্তর না দিয়াই সেই রমণীর সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

দেবদত্তের পীড়া বৃদ্ধি হইলে প্রতিধ্বনি এই বাটীতে যখন তখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, এবং কোন বিপদ আপদ হইলে এই দাসী ও এই রমণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান; এই জন্য পাহারাওয়ালাগণ ইঁহাকে বেশ চিনিত, অতএব তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের পথ ছাড়িয়া দিল।

প্রতিধ্বনি সঙ্গিনী রমণীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহাদের পশ্চাতে সেই কালো-বেশধারী ভূত চলিতেছিল।

প্রতিধ্বনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইলেই দেবদত্ত দুই হাতে চক্ষু আবরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে নীরব ক্রন্দন কি যন্ত্রণার, কি বেদনাব্যঞ্জক মর্ম্মব্যথা ও অবক্তব্য দুঃখ অশ্রুরূপে ফুটিতে লাগিল।

সহসা প্রতিধ্বনি সঙ্গিনীকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনিও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সঙ্গিনী রমণী তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিয়া হাত ধরিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন এবং দুইজনে পাশাপাশি হইয়া বসিলেন। তখন রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আবার নূতন কি খবর আছে বল, চিররুগ্ন স্বামী ও সদ্যসমাগত দারিদ্র্য-পীড়ন এইত জানি, আবার নূতন কি বিপদ?"

প্রতিধ্বনি তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের বিষয় সমুদায় জানাইলেন। রমণী তাহা শুনিয়া মর্ম্মাহতা হইলেন ও কিছুক্ষণ পরে রোষকম্পিত স্বরে চণ্ডদেবকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "রে নরাধম! তোর অধঃপতনের সময় ঘনাইয়া আসিতেছে।"

প্রতি—তোমাকে ইহার উপায় করিতে হবে।

রমণী—ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিবেন, আমাকে যাহা করিতে বল, প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও তাহা করিতে রাজী আছি।

প্রতি—আমার অবস্থাতো সমস্তই অবগত আছ, আমার ধনবল নাই, জনবলও নাই, আছেন কেবল ঈশ্বর।

রমণী—তোমার উপকার সাধন করিতে ঈশ্বর আমায় বল প্রদান করুন।

প্রতি—তোমার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি দ্বারা বরাহপুরে আমার পিতা ইন্দ্রমৌলী মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ পাঠাইবে। আমি আট দিন মাত্র সময় পাইয়াছি। বরাহপুরে যাইতে তিন দিন ও আসিতে তিন দিন, মধ্যে মাত্র দুই দিন সময়। ঠিক আট দিবসের রাত্রে আমার পিতা আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিবেন। পথিমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্বও আমার ঘোর সর্বনাশের কারণ হইবে। এই কথাতেই বুঝিতে পারিতেছ, কি প্রকারের লোক প্রেরণ করা উচিত।

প্রতিধ্বনি কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভাবিলেন; পরে কহিলেন, "ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় দেখি না, আমি নিজে অনেক উপায় করিতে জানি, কিন্তু এ সময় সে সকলের সময় নয়, এই দুঃখ। স্বামী চলৎশক্তি-হীন রোগী, সুতরাং আমিও চলৎশক্তি-হীনা হইয়া পড়িয়াছি; নচেৎ দেখিতাম, চণ্ডদেব কেমন পুরুষ ও আমি কেমন স্ত্রীলোক।"

রমণী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি কহিলেন—আমার বিশ্বস্ত লোক কে? কাহাকেও ত বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হয় শুধু একজনকে, সে কে? সে আমার প্রাণের অধিক, সংসারের একমাত্র অবলম্বন, আমার পরম স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাহাকেই পাঠাইব। যদিও এ কাজে অনেক বিপদ ও সে বিপদ যেমন তেমন বিপদ নয়, সেই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে; তাহাতে জীবনের আশঙ্কাই অধিক; কিন্তু তাই বলিয়া আমি নিরস্ত হইতে পারি না। কারণ পুরুষের প্রাণ অপেক্ষা রমণীর সতীত্ব ধর্ম্ম অনেক অংশে উচ্চ। রমণীর ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যদি পুরুষের প্রাণও যায় তাহাতেও আনন্দ। ঐ পাষণ্ড আমার গর্ভধারিণী মাতাকে হত্যা করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তীব্র অহিফেন গুলিয়া পাষণ্ড আমার মাতাকে পান করাইয়াছিল, এক ঘণ্টা হইতে না হইতেই মা আমার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাষণ্ড মাতার বক্ষঃস্থল হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মাতাকে লইয়া গেল, জানি না তাঁহার মৃতদেহ কোথায় রাখিয়া আসিল। ওঃ! সে আজ পনর বৎসরের কথা, আমি তখন নয় বৎসরের বালিকা। পাষণ্ড! তুই ভাবিয়াছিস্ যে, আমি সে সকল বিস্মৃত হইয়াছি, কিন্তু আমি তাহার এক কণিকাও বিস্মৃত হই নাই। তুই ভাবিয়াছিস্ চিরকালই তোর দুষ্ট বুদ্ধিরই জয় হইবে, কিন্তু তাহা নহে; ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী বাক্য। তুই বুদ্ধিবলে গ্রামের

মধ্যে, দেশের মধ্যে সাধুতা স্থাপন করিয়াছিস্ তাহা ঠিক, কিন্তু বেশী দিনের জন্য নহে, দয়ালু ক্যানিং তোর শনি-স্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন; অতএব তোর দর্প ও কৃত্রিম সাধুতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে। তুই ভাবিয়াছিস্ আমার মাতার জীবনের সঙ্গেই তোর ঘৃণার্হ ও নৃশংস কার্য্যগুলির সাক্ষ্যদানের পথ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তোর সে কল্পনা বৃথা। সেই যে তখন তুই যাহাকে দুগ্ধপোষ্য শিশু ভাবিয়াছিলি, আজ সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুই তোর—

তাহার কথায় বাধা দিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা রমণীর অঙ্গ তাড়না করিয়া প্রতিধ্বনি কহিলেন, ওকি কর, চুপ কর।

রমণী দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া দাসী দ্বারা ভ্রাতাকে ডাকাইলেন। ভ্রাতা আসিলে তাঁহাকে সবিশেষ বলিলেন।

ভ্রাতা কহিলেন, আমি বিপদকে ভয় করি না, কিন্তু তাঁহার নিকটে কি বলিয়া বিদায় চাহিব?

রমণী—বরাহপুর ফলগুৎসবের জন্যই বিখ্যাত, তুমি ফলগুৎসব দেখিবার ছলে তাহার নিকট বিদায় চাও।

ভ্রাতা—আচ্ছা, ঈশ্বর আমাদিগকে অবশ্য রক্ষা করিবেন।

রমণী—যাও, কুশাগ্রও যেন তোমার চরণে বিদ্ধ না হয়। বিপদ যেন আমাকেই আক্রমণ করে, তোমাকে যেন ভুলিয়া যায়।

ভ্রাতা—তিনি অপুত্রক বলিয়া আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, তোমার কোন ভয় নাই, আমার বিশ্বাস তাঁহার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট হইবে না।

রমণীর ভ্রাতা ফলগুৎসবদর্শনের ছলে তাঁহার প্রতিপালকের নিকট বিদায় লইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক বরাহপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঠকপাঠিকাগণ! ইনিই আমাদের সেই পথিক। ইঁহার বয়স বিংশতি বৎসর মাত্র, নাম নন্দক। ইঁহার অগ্রজার নাম চন্দনী। চন্দনী নন্দককে বিদায় দিয়া আপন কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাতলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্য উঠে নাই, পূর্ব্বদিক লালও হয় নাই। তখনও শিশির পড়িতেছে। কোনও গাছে লাল, কোনও গাছে নীল, কোনও গাছে সাদা পুষ্প-স্তবকগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া প্রভাত-প্রকৃতির বালাক্রীড়াকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূরিত করিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে তখনও অন্ধকার ও গাঢ় অন্ধকাররাশি পরিলক্ষিত হইতেছিল।

চন্দনী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়াও কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সে শয্যাতলে উপবিষ্ট হইয়াই অস্পষ্ট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পৃষ্ঠে হঠাৎ কে যেন একটী সূচাগ্র বিদ্ধ করিয়া দিল। তখন সে অল্প আঘাতেই অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িল, এবং শয্যার উপর পতিত

হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহার হস্তপদ অবশ ও শিথিল হইতে লাগিল। সে তখন স্বপ্নে দেখিতে লাগিল একজন বিকটাকার ভূত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "অজ্ঞান হইয়া পরম পিতার নিকট আশ্রয় চাও; কারণ পিতা অজ্ঞান ও অবোধ সন্তানকে অধিক স্নেহ করেন।" বাস্তবিক পিতার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইলে অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান-গরিমা-পরিশূন্য হইয়াই প্রার্থনা করা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিব না তাহা নহে। তাহা হইলে ভগবানের জ্ঞানময় নিত্য-স্বরূপ উপলব্ধি করিব কি করিয়া? পিতা অজ্ঞান সন্তানদিগকে কৃপা করিতে পারেন বটে, কিন্তু আমরা যদি চির-অজ্ঞান থাকি, তাহা হইলে তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইব কি করিয়া এবং আমাদের আত্মার উৎকর্ষসাধনের আশাই বা কোথায়? Perfection theory তাহা হইলে এইখানে উঠাইয়া দিতে হয়। ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "এমন মানবজন্ম রইল প'ড়ে, আবাদ ক'র্‌লে ফল্‌তো সোণা।" বস্তুতঃ দুর্লভ মানবজন্ম পাইয়াছি; যতই জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিব, ততই জীবন বহুমূল্যবান্ হইবে এবং ততই আমরা পরম পিতার নাম গানে উপযুক্ত হইব। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্তও গভীর জ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। কিরূপে তিনি স্থবির হইয়াও এত গভীর গবেষণায় সমর্থ হইতেন? এই উপলক্ষে একদা তিনি পণ্ডিত শিবনাথকে বলিয়াছিলেন, "আমার জাহাজ শীঘ্র ছাড়িবে, যত বোঝাই লইতে পারি।" ধন্য দেবেন্দ্রনাথ—তুমিই বুঝিয়াছিলে এ জীবনে যতই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিবে, ততই পরম পিতার নিকট ভালবাসা পাইবে। তাই বলি, যদি আমরা ভগবৎপ্রদত্ত সুবৃত্তিগুলির উন্নতি ও অজ্ঞানতার আবরণ দূরে নিক্ষেপ না করি, তাহা হইলে কেমন করিয়া ভগবানের বিরাট স্বরূপ কল্পনা করিব?

অজ্ঞানতা ও বদ্ধজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্মভাবের কি ভয়ানক অনর্থ সাধন করিয়াছে তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক অজ্ঞানতা বা বদ্ধজ্ঞানতার সহিত ধর্ম্মভাবের কিরূপ সম্বন্ধ। অজ্ঞানতা সনাতন ধর্ম্মকে সহজ-

সাধ্য করিতে গিয়া পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিরাট পরমব্রহ্মকে গাছ, পাথর, পুতুল অথবা মনুষ্যবিশেষে পর্য্যবসিত করিয়াছে। আবার বর্ত্তমান শিক্ষিতসম্প্রদায় স্ফীতবক্ষে পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে গিয়া বলেন, "কেন, তুমি যে পৌত্তলিকতা পৌত্তলিকতা বলিতেছ, এই গাছ, পাথর ইত্যাদি কি সেই বিরাট পরব্রহ্মের অংশ নয়? মানুষের অত্যল্প ক্ষমতা, তাই এই সকল ক্ষুদ্রাংশে তাঁহার বিরাট দেহের আরোপ করা হইয়াছে। তুমি কি কখন এই পুতুলপূজার সময় বয়োবৃদ্ধ ও শিশুদিগের প্রাণের সরলতা দেখিয়াছ, ইত্যাদি।" স্বীকার করি যে, মানবমনের অত্যল্প ক্ষমতায় সেই বিরাট পুরুষের ধারণা হয় না; কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, তরুশিরলক্ষ্যকারীর তীর অপেক্ষা আকাশলক্ষ্যকারীর তীর বহুদূর উত্থিত হয়। এই উন্নতিশীল মন কখনও স্থির থাকিতে পারে না। একটী বিশেষ বস্তু বা একজন বিশেষ মহাপুরুষে ভগবানের আরোপ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলাম; কিন্তু এমন এক সময় আসিবেই আসিবে, যখন আমি ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের শেষ সীমায় আসিয়া পড়িব। তখন মরণশীল একজন মানুষে বা বিধ্বংসী একটী পদার্থে অনন্ত ব্রহ্মের আরোপ যে কি ভ্রমাত্মক তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। বিশেষতঃ আমি যদি একটী অসম্পূর্ণ মানুষকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ বলিয়া পূজা করি, আমি কিছুতেই ত ছয়টী ঐশ্বর্য্যের সম্যক্ সম্মিলন একটী মনুষ্যে পাইব না; পরন্তু আমি তাঁহার দোষগুলির (মানুষ পূর্ণ নয়, সুতরাং দোষ থাকিবেই থাকিবে) অনুকরণেও যত্নশীল হইব। তাই বলি, মন যখন ক্রমোন্নতির পথে সর্ব্বদা যাইতে চায়, তখন আদর্শ ছোট করিয়া ফেলা ভাল নয়। পরমহংসদেব বলিয়াছেন, "জ্ঞানমার্গীদের জন্য নিরাকার উপাসনা, এবং অজ্ঞানীরা সাকার উপাসনা করিবে।" সত্য বটে অজ্ঞানীদের জন্য ভগবানের একটা আকার চাই, নতুবা তাঁহার প্রেমময় পবিত্র স্বরূপের ধারণা করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার এই বিরাট বিশ্বরূপ থাকিতে অন্যরূপ গঠনের আবশ্যকতা কি? সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু যাহা আমাদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন, তাহাদিগকেও ভগবানের রূপ বলিয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিলে কি যুক্তিযুক্ত কাজ হয় না? ইহাতে পূজার বৃথা আড়ম্বর থাকে না এবং দলাদলিও থাকে না। ভক্ত রামপ্রসাদ মনের ভ্রম দেখাইয়া বলিয়াগিয়াছেন যে, জগৎ মায়ের মূর্ত্তি, তাঁহার অন্য মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া ডাকের গহনা দিয়া সাজানর অবশ্যকতা কি? তাই বলি, মনের ভ্রম ঘুচাইয়া তাহাকে উন্নতিমার্গে লইয়া যাও, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিবে এবং নিজেও ধন্য হইয়া যাইবে। জ্ঞানমার্গই একমাত্র ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ জানিবার প্রশস্ত পথ।

অনেকে বলেন, "আমার সাকার উপাসনাই ভাল লাগে, নিরাকার ব্রহ্মের আমি ধারণা করিতে পারি না; ভগবান্ যেমন মন দিয়াছেন, আমি সেইরূপ ধারণা করি, তাহার বেশী আমার সাধ্যাতীত।" তাঁহাদিগকে বলি এই যে, মনের অবস্থা কি চিরদিন স্থির থাকে? তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি যে, দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের মনের ভাব যেরূপ ছিল, এখন তাহা তদপেক্ষা অনেক বিকাশ পাইয়াছে কি না? তাঁহারা প্রথম হইতে যেমন শিক্ষা পাইয়াছেন, তাহাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরদত্ত বহুমূল্য বৃত্তিগুলির ত ক্রমোন্নতি করা চাই। তাহা হইলেই সাকার উপাসনার ইচ্ছা কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। আর তখন এদল ওদলকে আক্রমণ করিয়া ধন্য হইতে প্রয়াস পাইবেন না, বরং তাহাতে মনুষ্যসমাজে ভ্রাতৃভাব প্রবল হইবে। আমাদের মনোবৃত্তিগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমেই বিকাশ পাইতেছে; এরূপ অবস্থায় একটী অসম্পূর্ণকে পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া নিজের অব্যবস্থিততার পরিচয় দিই কেন? বহুজ্ঞানিগণ সাকারবাদী বলিয়া যে তাঁহারা ভগবানের নিকট অপ্রিয় তাহা নহে। প্রেমময়ের অপার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলে কাহারও কি অস্তিত্ব-সম্ভাবনা থাকে? অধিকন্তু এক একজন সাকারবাদী তাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্র ও তন্ময়তাবলে আধ্যাত্মিকতায় এতদূর উন্নত হন যে, সবিস্ময়ে তাঁহাদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। এই হেতু মহাত্মা কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি পরমহংসদেবের নিকট এত যাইতেন ও তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন। আবার কোন কোন সাকারবাদী তন্ময়তাবলে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিয়া সাধারণের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে সাকারবাদের পৃষ্ঠপোষক করেন। কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ বা ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেহই অষ্টসিদ্ধি লাভের ইচ্ছা করেন নাই। জ্ঞানী বুদ্ধদেব ত অষ্টসিদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেনই না। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, অজ্ঞানতাই সাকার উপাসনার সৃষ্টি করিয়াছে এবং অজ্ঞানীরাই বহুবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া সামাজিক একতাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

দুর্ব্বল মনই প্রকৃত ভগবদ্‌জ্ঞানলাভের ঘোর অন্তরায়। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব এক সময় স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলিয়াছিলেন যে, কেন তিনি এত শীঘ্র ভগবৎপ্রেমে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, সমুদ্রে হাতী নামিলে সমুদ্রের জলের কোন ব্যতিক্রমই হয় না; কিন্তু পুকুরে যদি হাতী নামে, তাহা হইলে তাহার জলকে তোলপাড় করে। আমার মনটী অতি ক্ষুদ্র, তাই আমি তাঁহার একটু আলোচনাতেই অধীর ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ি। আর তোমার মনটী সমুদ্রবৎ, তাই তুমি এত ভাব চাপিয়া তাঁহাকে উপলব্ধিকরিবার মহা সুবিধা পাও।" কি

অকপট অন্তঃকরণে পরমহংস দেব তাঁহার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন বলিয়া ভগবানের অনন্ত প্রেম অনুভূতির সুযোগ হারান। যদি অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িলাম, তবে আনন্দ উপলব্ধি করি কি করিয়া? সত্য বটে যে, সারাৎসারের অনন্ত প্রেমের এক বিন্দুও অনুভব করিতে গেলে মানবের ধৈর্য্যচ্যুতি সম্ভব। কিন্তু এরূপ সময়ে ভাব চাপিয়া রাখিয়া কি তাঁহাকে আরও ভাল করিয়া জানা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয়? অধিকন্তু আমাদিগকে দুর্ব্বলচেতা বলিয়া নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে হয় না। অনেকে বলেন, এরূপ অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা। এই অবস্থায় মানব এই জড় জগতের মায়া হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতায় ডুবিয়া থাকেন ও ব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত হন। আমি কখন এরূপ অবস্থায় উপনীত হই নাই; সুতরাং জানি না যে ইহাতে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়, কি আধ্যাত্মিকতায় ডুবিয়া থাকিতে হয়। তবে পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানব, যাহারা ভগবান্‌কে কেবলমাত্র ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছে (হয়ত অন্য গ্রহ-উপগ্রহবাসী মানবেরা ভগবানকে দশৈশ্বর্য্যশালী বা ততোধিক ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া থাকে), তাহারা যে কিরূপে বিরাট ব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলেই চিন্তা করুন। যাহা হউক, এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি যে দুর্ব্বলতা হইতেই হয়, তাহা নিশ্চিত। এই দুর্ব্বলতা আমাদিগকে অনেক সময় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহাতে মানব ধর্ম্মজ্ঞানের আবরণ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভক্তির আবরণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ঢলাঢলি যে ভগবৎপ্রেমলাভের আনুষঙ্গিক, তাহা অনেকেই স্থির করিয়াছেন। কেন, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব ত ভগবৎপ্রেমে ঢলিয়া পড়েন নাই; বরং সৌম্যভাবে তাহা এমন উপলব্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রদর্শিত মার্গে এখন পৃথিবীর সকল সভ্যজাতিই যাইতে চাহিতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারের কার্য্যের গুরুত্ব ভুলিয়া গিয়া সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতি হইয়াছেন; এবং কর্ম্মজীবন হইতে অনেক নীচে নামিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অতি পুরাণ হিন্দুজাতির এই দুরবস্থা। এমন কি, কয়েকজন মাত্র মুসলমান সৈন্যের ভয়ে নিজরাজকার্য্যবিরত অথচ ধর্ম্মপ্রাণ রাজা লাক্ষ্মণেয় সেন, ভগবান্ তাঁহার উপর যে রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জ রক্ষার ভার দিয়াছিলেন তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভক্তির আবরণে ধর্ম্ম ছিল বলিয়া এই দুর্দ্দশা। জ্ঞানের আবরণ থাকিলে মানুষ কর্ম্মময় জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করা ভগবানের অর্চ্চনার এক অঙ্গ ধরিয়া লয়েন। এইরূপে তাঁহার কর্ম্ম শেষ হইলে তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে আনন্দাশ্রু মোচন করেন। মহাত্মা চৈতন্যদেবের ভক্তি ও প্রেম অনুকরণীয় বটে, কিন্তু ঢলাঢলিটা

তাহার আনুষঙ্গিক নহে। জ্ঞানিগণ প্রেম ও ভক্তির অধিকারী হইয়াও টলিয়া পড়েন নাই এবং দুর্ব্বলতা তাঁহাদের নিকট স্থান পায় না; কাজে কাজেই তাঁহারা ব্রহ্মের বিরাট স্বরূপ ক্রমেই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

অজ্ঞানিগণ যেরূপ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, সেইরূপ জ্ঞানিগণও ব্রহ্মের উপলব্ধি হেতু প্রেম ও ভক্তি লাভ করিয়া বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবেন। এই বিজ্ঞান জ্ঞানেরও উচ্চে; ইহা Science নয়। ইহাকে Metaphysics অর্থাৎ তত্ত্ববিজ্ঞান বলা যায়। তখন তাঁহারা এই জড় জগতের মায়া কাটাইয়া অধ্যাত্মরাজ্যে বিরাজ করেন, এবং পরমহংস, মহর্ষি প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হন। রামকৃষ্ণ দেব এই অবস্থায় উপনীত হইয়া বলিয়াছেন, "মা! এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা!" এই জন্যই তিনি সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া গিয়া সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে সমান চক্ষে দেখিয়াছেন। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি, যদি তারা না মানে প্রবোধ, তাদের জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।" বাস্তবিক বিজ্ঞানের আশ্রয় লইলে আর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান থাকে না; একেবারে ভগবৎপ্রেমে মত্ত হইয়া থাকিতে হয়। এ অবস্থায় মনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় স্থান পাইতে পারে না, সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব-দর্শন হয়। জ্ঞানী বুদ্ধদেব, প্রেমিক যিশু, ধর্ম্মবীর মহম্মদ, বিশ্বাসী নানক সকলেই এই শ্রেণীর লোক। বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াই তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিভাবলে যে ধর্ম্মরাজ্যসমূহের পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ক্রমে পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণও ঐ কারণে সনাতন ধর্ম্মের স্থাপনা করিয়া প্রথমেই সভ্যতার আলোক জ্বালাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কি অজ্ঞানী, কি জ্ঞানী, কি বিজ্ঞানী, সকলেই ভগবানের রাজ্যে বাস করিয়া অল্লাধিক তাঁহার নাম করিয়া শান্তিলাভের প্রয়াসী। নদী সকল যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক না কেন, এক সমুদ্রে পড়িবে। মানুষের সহিত ব্রহ্মের একটা সম্বন্ধ আছে। সেটা কি শুধু জটিল, মানববুদ্ধির অতীত বিষয়ে ইচ্ছাময়ের বিশ্বজনীন ইচ্ছার দোহাই দিয়া শান্তিলাভ করা? প্রথমতঃ তাহাই অনেকের নিকট প্রতীয়মান হয়, কিন্তু শুধু তাহাই নহে। আমরা যে তাঁহাকে পাইতে চাই তাহার কারণ আছে। অজ্ঞান শিশু যেমন অন্যের ক্রোড় হইতে ঝাঁপাইয়া তাহার পিতা-মাতার ক্রোড়ে যাইয়া সুখভোগ করিতে চায়, অজ্ঞান আমরাও তেমনি এই সংসারমায়ায় আবৃত হইয়া তাঁহার শান্তিময় চরণপ্রান্তে যাইয়া অমৃতের অধিকারী

হইতে প্রয়াস পাই। বাস্তবিক তাঁহার সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন ভিন্ন আর রক্ষার উপায় নাই। "পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।" আমি যদি অমৃতের অধিকারী হইতে চাই, তাহা হইলে আমাকে তাঁহার নিকটে অবোধ সন্তানের ভাবেই যাইতে হইবে। জ্ঞানময় ব্রহ্মপ্রেম (love) ও পবিত্রতার (righteousness) আধার। কাজে কাজেই তাঁহার সন্তানগণ আমরা প্রেমিক ও পবিত্র হইয়া শান্তিলাভের প্রয়াসী; এবং তাই সমাজে অপবিত্রতা ও অশান্তি দেখিলে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিবারণ করি।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরমেশ্বর মানবমাত্রকেই যথাযথ বুদ্ধি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন। ভগবানের প্রদত্ত সেই বুদ্ধি ও শক্তির পরিচালনা দ্বারা প্রত্যেক মানবেরই উন্নতির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বিনা পরিশ্রমেই উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। আবার অনেকে পরিশ্রমে নিযুক্ত হন সত্য, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই তাহার ফল প্রাপ্ত না হইলে ভগ্নহৃদয়ে কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকেন। আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ এরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি কর্ম্মবীর ছিলেন, পরিশ্রমেই তাঁহার আনন্দ ছিল। পরিশ্রম করিলেই যে তাহার একটী ফল পাওয়া যায় এ কথায় অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু আব্রাহামের সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি উন্নতির শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। এটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আব্রাহাম্ মিষ্টার ষ্টুয়ার্টের সহিত স্প্রিংফিল্ডে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্যকুশলতায় মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, অনেক সময় তিনি আব্রাহামের উন্নতির চেষ্টায় স্বীয় স্বার্থত্যাগেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আব্রাহাম্ এই সুযোগে আপনার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা দ্বারা ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ ক্রমান্বয়ে আট বৎসর ব্যবস্থাপক মনোনীত হইয়াছিলেন। স্প্রিংফিল্ডে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইত; সুতরাং সেখানে থাকিয়া তিনি ব্যবস্থাপকের ও আইন-ব্যবসায়ের কার্য্য করিতে পারিতেন। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের সময় তিনি আপনার সদ্‌যুক্তিপূর্ণ

বক্তৃতা দ্বারা, নানা বিষয়ে সভামণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিতেন। সভাগণ সকলেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। মিষ্টার ষ্টুয়ার্টের সহিত কিছুকাল কার্য্য করিবার পর তিনি ক্রমান্বয়ে জজ এস, টি, লোগান (Judge S. T. Logan) ও উইলিয়ম্ এইচ হারণ্ডন্ (William H. Herndon) নামক দুই জন ভদ্র লোকের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। সৎপথ অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে মানবের উন্নতি যে অনিবার্য্য এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আব্রাহাম্ লিন্কন্ জ্ঞানে কখনও মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। বিপন্ন এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে তিনি বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। আধুনিক আইন-ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অর্থপিপাসা লক্ষিত হইত না। অনেক সময় অর্থগ্রহণ না করিয়াই তিনি নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণকে মোকদ্দমার দায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার সততা ও স্বার্থত্যাগের কয়েকটী মাত্র ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল—

প্রথম। এক সময় আব্রাহাম্ লিন্কন্ কোনও এক সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তির একটী মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদায় কাগজপত্র দেখিয়া তিনি ভদ্র লোকটীকে বলিয়াছিলেন যে, আইনের যুক্তিদ্বারা তাঁহার জয়লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইতে হইবে। তিনি মোকদ্দমা গ্রহণ না করিয়া তাহার মীমাংসার জন্য সৎপরামর্শ দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়। একদা আব্রাহাম্ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় অপরাধীর পক্ষাবলম্বন করেন। মোকদ্দমার সময় তিনি কোনও উপায়ে জানিতে পারিলেন যে, সে ব্যক্তি বাস্তবিকই হত্যাপরাধে অপরাধী। তিনি তৎক্ষণাৎ বিচারস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য এক উকিলের সাহায্যে হত্যাকারী সেই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভের পর সে আব্রাহাম্ লিন্কন্‌কে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে আব্রাহাম্ লিন্কন্ তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন।

তৃতীয়। নিউ অর্লিন্সে দাসব্যবসায়িগণ এক সময়ে কোনও এক নিগ্রো রমণীর একমাত্র পুত্রকে কারাগারে অবরুদ্ধ করে। পুত্রহারা জননী শোকসন্তপ্তহৃদয়ে আব্রাহামের নিকট গিয়া সকল কথা জানাইল। আব্রাহাম্ তাহার পুত্রের মুক্তির জন্য ইলিনয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তার নিকট পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। শেষে তিনি এবং মিষ্টার হারন্‌ডন্ দুইজনে উপযুক্ত অর্থপ্রদান করিয়া নিগ্রো রমণীর পুত্রটীকে নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ। ফরিয়াদীর পক্ষাবলম্বন করিয়া একদিন আব্রাহাম্ লিন্‌কন্ একটী লোকের নিকট কয়েক শত টাকার দাবি দিয়া নালিশ করেন। মোকদ্দমার দিন প্রতিবাদীর উকিল বিচারালয়ে এই মর্ম্মে একখানি রসিদ দাখিল করিলেন যে, দাবির টাকা বহুদিন পূর্ব্বেই পরিশোধ হইয়াছে। আব্রাহাম্ তৎক্ষণাৎ বিচার-স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রবঞ্চকের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে সহস্রবার ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

স্প্রিংফিল্ডে আইনব্যবসায়কালে আব্রাহামের জীবনের এইরূপ অনেকানেক আখ্যায়িকা শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু আমরা আর তাহার অধিক আলোচনা করিতে চাহি না; নিম্নে একটীমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব।

কোনও এক সময় আরমষ্ট্রং নামক একটা যুবক হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। এই যুবকের বৃদ্ধ জনকজননীর নিকট আব্রাহাম্ এক সময় কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আব্রাহামের ধর্ম্ম ছিল। তিনি কোনও রূপে জানিতে পারিলেন যে, আরমষ্ট্রং সত্যই নিরপরাধী; কয়েক জন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রেই সে এই ভীষণ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছে। আরমষ্ট্রং হত্যাপরাধে অভিযুক্ত শুনিয়া আব্রাহাম্ তাহার জননীর নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন এবং স্বয়ং আরমষ্ট্রংএর পক্ষ অবলম্বন করিবেন, জানাইলেন। ক্রমে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষীয় উকিল মহোদয়গণ উপস্থিত হইলে মাননীয় বিচারপতি মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। বাদীর উকিল আরমষ্ট্রংকে অপরাধী প্রমাণ করিবার জন্য নানা যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। আব্রাহাম্ এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন; বাদীর উকিল আসন পরিগ্রহ করিলে তিনি বাদীর একটী প্রধান সাক্ষীর জেরা করিলেন। সত্যের সর্ব্বত্রই জয়। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন আইনজ্ঞ আব্রাহাম্ লিন্‌কনের জেরায় সাক্ষীর মুখ হইতে সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। আরমষ্ট্রং নির্দ্দোষী প্রমাণিত হইল। মাননীয় বিচারপতি মহাশয় তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং আব্রাহামের বুদ্ধি ও জ্ঞানের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। আরমষ্ট্রংএর মাতা আব্রাহামকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আব্রাহাম্ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

স্প্রিংফিল্ডের আইনব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অবকাশসময়ে অশ্বারোহণে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইবার প্রথা পরিলক্ষিত হইত। আব্রাহাম্ লিন্‌কনেরও একটী অশ্ব ছিল। অন্যান্য আইনব্যবসায়ী-দিগের সহিত তিনিও অশ্বারোহণে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। শৈশবে পদব্রজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিবার সময় যেমন তিনি পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিতেন, অশ্বারোহণে গমনকালেও

তাঁহাকে সেইরূপ অধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিতে দেখা গিয়াছে। এই দেশভ্রমণ-কালে পথিমধ্যে কোনও কাঠুরিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতেন এবং কাঠুরিয়ার হস্ত হইতে কুঠার লইয়া কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেন। ইহাতে তিনি হৃদয়ে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি যেখানেই গমন করিতেন, সেইখানেই আপনার মধুর ব্যবহারে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত ও আদৃত হইতেন।

স্প্রিংফিল্ডে অবস্থানকালে আব্রাহাম্ স্বীয় উপার্জ্জনের অর্থ জনকজননীর নিকট পাঠাইতে বিস্মৃত হইতেন না। ১৮৪২ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসে তেত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কেণ্টকীর অন্তর্গত লেক্সিংটনের মাননীয় এস্ টড্ (Honorable S. Todd) এর কন্যার সহিত আব্রাহাম্ লিন্‌কনের শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। আব্রাহামের চারিটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় পুত্রটী বাল্যাবস্থাতেই এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রদ্বয় যথাক্রমে দ্বাদশ ও বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কেবলমাত্র প্রথম পুত্রটীই আব্রাহামের এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম রবার্ট। তিনি উত্তরকালে ওয়াশিংটনের সমর-বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী অব্যর্থ পাচন।

গোলঞ্চ	সিকি তোলা
ক্ষেতপাপ্‌ড়া	"
লাটার কচি ডগা	"
পুরাতন নিমবৃক্ষের ছাল	"
পল্‌তা	"
শিউলিপাতা	"
ধনে	"
মিশ্রি	"

এই সকল দ্রব্য একত্রে শিলে থেঁতো করিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে প্রাতঃকালে এক ছটাক পরিমাণে ও বৈকালে এক ছটাক পরিমাণে সেবন করিতে হইবে। এক সপ্তাহ কাল খাইলেই জ্বর আরোগ্য হয়। যদি জ্বর আরোগ্যের পরও আর কিছুদিন এইরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে পুনরায় ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িবার আশঙ্কা দূর হইবে। জ্বরের সহিত যদি সর্দ্দি ও কাশি থাকে, তাহা হইলে সিকি তোলা কণ্টিকারি দিয়া পাচন সিদ্ধ করিবে। জ্বরে এবং জ্বর-বিচ্ছেদে, সকল সময়েই এই ঔষধ খাওয়া চলে।

নূতন সংবাদ।

১। জার্ম্মণীর যুবরাজ মথুরা নগরে বেড়াইতে যাইয়া তথাকার একাগাড়ী দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দুইখানি একাগাড়ী, দুইটা একাগাড়ীর ঘোড়া এবং দুইজন এদেশী একাচালককে রাজধানী বার্লিনে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

২। আশ্চর্য্য শ্রুতিধর। কাটিহার-নিবাসী শ্রীযুক্ত পি, এন, শুক্ল নামক এক ব্যক্তি সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের সাক্ষাৎলাভের আশায় বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। ইনি অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এবং সেই ক্ষমতা সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া তথায় গিয়াছেন। ইঁহার বয়স ৪০ বৎসর হইবে। এই অদ্ভুত ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত মর্ণিংলিডার পত্রিকার প্রতিনিধি মহাশয় ক্রমাগত ১৮০টি লাটিন কথা উচ্চারণ করিলে, শুক্ল মহাশয় তাহার পরক্ষণেই সেই সকল কথা অবিকল বলিলেন; অথচ ইনি ঐ ভাষা আদৌ জানেন না। যদি একজন গল্প বলেন ও অপর একজন ঘণ্টা বাজায়, তাহা হইলে ইনি সেই গল্প ও কতবার ঘণ্টা বাজিয়াছে তাহাও বলিতে পারেন। ইনি পিয়ানো বাজাইবার সময়ে অথবা দাবা কি তাস খেলার সময় তিন চারি লাইনের কবিতা রচনা করিতে পারেন। ইহার প্রত্যেক লাইনে শ্রোতৃবর্গপ্রদত্ত এক একটী করিয়া শব্দ যোজনা থাকিবে। ইনি ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন। ইঁহার স্ত্রীও নাকি এইরূপ গুণে গুণান্বিতা।

৩। রাজসহচর। যখন ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ভারতে আগমন করিবেন, তখন ইংলণ্ডের স্বনামধন্য রণ-পণ্ডিত ফিল্ড মার্শেল লর্ড রবার্টস তাঁহার সহচররূপে ভারতে আসিবেন।

৪। নূতন গাড়ী। আগামী ১৯১২ খৃষ্টাব্দের দিল্লী দরবারের জন্য এখন হইতে আয়োজন হইতেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী এখন হইতেই নূতন গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লী দরবারের ময়দান পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত হইবে, সহরে দুই তিনটা ষ্টেশন হইবে। যাহাতে লোক যাতায়াতের পক্ষে সুবিধা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

বামারচনা।

নিবেদন।

(১)

তোমার এ বিশ্বরাজ্যে আমি অভাজন,
নাহি জানি পূজা ধর্ম্ম,
না জানি করিতে কর্ম্ম
কেবল স্বার্থের পঙ্কে আছি নিমগন।
পাপে তাপে জর্জ্জরিত
সদাই আমার চিত,
শুধু "দাও" "দাও" শব্দ অন্তরে আমার,
মেটে না অতৃপ্ত আশা,
প্রাণভরা শুধু তৃষা,
বাসনা জাগিয়া হৃদে উঠে অনিবার।

(২)

কিনা তুমি দিয়াছ গো এ অধম জনে?
দেছ প্রাণ দেছ হিয়া,
মরমে শকতি দিয়া
গঠিয়াছ আমারেও তুমিত যতনে।
কিন্তু নাথ! কেন বল,
অন্তর না তৃপ্ত হ'ল,
দুরাশা এমন কেন দিলেগো আমায়?
দাও নাই রত্ন ধন,
তাহাতে কি প্রয়োজন?
ধনেই কি মানবের সব জ্বালা যায়?
অতৃপ্ত বাসনা হেন,
আমারে গো দিলে কেন?
কৃপা কর কৃপাময়! অভাগা অধমে।
দাও শান্তি, তৃপ্তি, আশা,
মুছে দাও এ দুরাশা
শান্তির প্রবাহ সদা বো'ক এ মরমে।

(৩)

আমারে যা দেছ নাথ, দিব তা' তোমায়,
লহ ভক্তি পুষ্পহার,
লহ প্রেম অশ্রুধার,
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ নিবেদি ওপায়।
আর যাহা দাও নাই,
দাও মোরে চাহি তাই,
দাও শান্তি তৃপ্তি প্রেম, দাও ভগবন্।
কাতর না হই দুঃখে,
ব্যথা সহি হাসিমুখে
দাও সেই শক্তি মোরে হে দীনশরণ!
দিবানিশি অবিরাম,
এ হৃদয়ে প্রাণারাম
পাই যেন হেরিবারে ও পুত চরণ।
না ভুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম,
সাধি যেন নিজ ধর্ম্ম
তোমার চরণে মতি থাক্ অনুক্ষণ।
দয়াময়! অভাগীর এই নিবেদন।

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

কাতর জিজ্ঞাসা।

(শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সেন, মাতুল মহাশয়ের মৃত্যুতে)

এখানে যে কত ক্লেশে, কত যাতনায়
ছিলে তুমি নিশি দিন,
রোগে শোকে বিমলিন,
পেয়েছ কি সুখ শান্তি পুণ্যঅমরায় ?

অহো! কি কঠিন ব্যাধি করেছিল গ্রাস!
পলে পলে ক্ষয় করি,
অবশেষে নিল হরি,
বুঝিল না করে গেল কি যে সর্ব্বনাশ!

দারুণ যাতনা, গলে নিদারুণ ক্ষত,
তাতে বাক্যহীন * হায়,
হৃদয় কাটিয়া যায়,
প্রাণ যায় প্রতি শ্বাসে আশঙ্কা সতত।

হয়েছে কি যন্ত্রণার সব অবসান ?
কাল ক্ষত গেছে সেরে,
বেদনা গিয়েছে দূরে,
বিমল আনন্দ কিগো লভিয়াছে প্রাণ ?

মামা!
সেই যে বিদায় নিয়ে আসিনু চলিয়া,
বুঝিয়েও বুঝি নাই,
শেষ দেখা দেখে যাই,
আশা ছিল ভাল হয়ে উঠিবে সারিয়া।

তবুও নয়নজল থামিল না হায়!
স্নেহভরে ধীরে ধীরে,
হাত বুলাইলে শিরে,
নীরবে আশীষ যেন করিলে আমায়।

নিজেও কাঁদিলে কত মর্ম্মবেদনায়
সেই দৃষ্টি বাক্যহীন,
ভুলিব না কোন দিন,
"এই শেষ দেখা" যেন আঁকা ছিল তায়!

হায়!
তুমি তো অমরদেশে গিয়াছ চলিয়া ;
সেই যে মলিন বেশ,
সেই যে দারুণ ক্লেশ,
হুতাশন সম প্রাণে উঠিছে জ্বলিয়া।

কোলে কি উঠেছে মামা শতদল (১) এসে,
ভূপেন (২) আসিয়া কাছে
পদতলে বসিয়াছে ?
রোগ, শোক গেছে, সুখে আছ দেবদেশে ?
তুমি যে শান্তিতে আছ ভুলেছ যাতনা,
এই শুধু আমাদের প্রাণের সান্ত্বনা।

শোকসন্তপ্তা,
সুরুচিবালা সেন।

* গলায় অস্ত্র করায় কথা বলিতে পারিতেন না।

(১) কন্যা।
(২) পুত্র।

প্রকৃতি।*

প্রকৃতিদেবীর শোভা, আহা কিবা মনো-
লোভা!
হেরিয়া জুড়ায় আঁখি আনন্দ অন্তর।
গাছে গাছে ভরা ফুল, মধুলোভে অলিকুল
ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে মত্ত নিরন্তর।

কাঁপাইয়া ফুলপাতা, কাঁপাইয়া ক্ষীণা লতা,
বহিয়া যাইছে ধীরে মৃদুল পবন।
পদ্মপত্র-পরে জল করিতেছে টলমল,
নিশির শিশির শোভে পাতায় কেমন!

কোথা বেগবতী নদী বহিছে পর্ব্বত ভেদি,
কোথাও শোভিছে উচ্চ দেব-নিকেতন।
উড়িতেছে উর্দ্ধে পাখী, ডাকিতেছে থাকি
থাকি,
কেহবা করিছে সুখে ভূমে বিচরণ।

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী, মৃদু মৃদু মন্দগতি,
সাগর-উদ্দেশে বহি যায় মনসুখে।
ক্ষুদ্র শাখানদী যত, মিশিয়াছে পথে কত,
গঙ্গার সঙ্গেতে বহে পৃথিবীর বুকে।

এইরূপ কত শোভা মনুষ্যনয়নে কিবা
ভাসিতেছে প্রতিদিন, কিন্তু মোরা হায়!
কাহার সৃজিত মোরা,কে সৃজিল বসুন্ধরা,
বিপদে রক্ষিছে সদা কেবা পায় পায়?

নাহি বুঝি, নাহি জানি, কোন্ ক্ষুদ্র কীট
আমি,
বুঝিতে পারিব এই লীলা বিধাতার।
শুধু এ বাসনা মোর, ঈশ্বরে বিশ্বাস ঘোর
থাকে যেন, এই ভবে বাঞ্ছা নাহি আর।

কুমারী চারু গুপ্ত।

আমার দাদার স্মৃতি।

ধীরে মনে পড়িতেছে সেই সুখময় স্মৃতি,
হৃদয়ে জাগিছে ধীরে বিষাদের মৃদু গীতি,
আজি মনে পড়িতেছে সেই সে ভীষণ রাতি,
স্বরগে চলিল দাদা চিরজীবনের সাথী।
ভুলেছি সে সব কথা, স্মৃতিপটে লয় প্রায়,
স্বপনের মত আজি কেন মনে হ'ল হায়!
বৎসরান্তে তার কথা পড়েনা আমার মনে,
সে স্মৃতি অন্তরে আজি জাগিলরে কি
কারণে?
নয়টী বছর হ'ল, গেছ দাদা! অমরায়,
স্বপনেতে একবার দেখা ত দাও না হায়!
ক্রমে ক্রমে পলে পলে অতীত হইবে লীন,
মৃদু স্মৃতিটুকু হায়! স্মৃতিপটে হবে লীন।

সুরুচিবালা সেন।

---

* একাদশবর্ষীয়া বালিকার লিখিত।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 570. February, 1911

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। { মাঘ, ১৩১৭। ফেব্রুয়ারি, ১৯১১। } ৯ম কল্প।
৫৭০ সংখ্যা। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কংগ্রেস—আগামী বৎসরে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। ১০ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে অভ্যর্থনা-কমিটির-সভাপতি নিয়োগ, সভ্য-সংখ্যা-বৃদ্ধি ও কর্ম্মচারি-নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পৃথিবীর আলো—জার্ম্মনীর একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন, পৃথিবীতেও এক প্রকার আলো আছে, তাহা হইতেই চন্দ্র-হীন অন্ধকারময় রাত্রিতে আলো পাওয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, অন্ধকারময় রাত্রিতে চন্দ্রোদয় না হইলেও পৃথিবী একেবারে অন্ধকারময় হয় না। পৃথিবীতে নক্ষত্র হইতে কতকটা আলোক আসে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি অল্প। চন্দ্রহীন রাত্রিতে যতটা আলো পাওয়া যায়, তাহার সমস্তটা তারকারাজি হইতে পাওয়া যায় না। এই আলোর পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্রশিকার—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীর দরবারের পর নেপালের জঙ্গলে ব্যাঘ্র-শিকারের জন্য যাইবেন; তাহার পর কলিকাতায় আসিবেন।

স্মৃতিফণ্ড—পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ভারতে যে চাঁদার ফণ্ড খোলা হইয়াছে, শুনিতেছি সেই ফণ্ডে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয় শত ছত্রিশ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আরও বত্রিশ হাজার পাঁচ শত আটাত্তর টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও আদায় হয় নাই।

লর্ড মিণ্টো—ভারতের রাজপ্রতিনিধি

লর্ড মিণ্টো নিরাপদে বিলাতে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। লর্ড মিণ্টো বিশেষ দক্ষতার সহিত ভারতবর্ষের বড়লাটের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বিলাতের অভিজাত-সম্প্রদায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ রিজ হোটেলে এক বিরাট ভোজ-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

ভারতে রাজ্যাভিষেক—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, আগামী ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক দরবার বসিবে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ সেই সময় বোম্বাই হইতে দিল্লী যাইবেন। দরবারের পর নেপাল যাইবেন এবং তথা হইতে কলিকাতায় আসিবেন। জানুয়ারী মাসে তিনি ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিবেন। সার জন হিউয়েট দরবার সম্বন্ধে বড় লাট ও মন্ত্রিসভার সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দরবারে কত টাকা খরচ হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। দরবার দিল্লীদুর্গে হইবে না; এই জন্য স্বতন্ত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের গমনাগমনের জন্যও স্বতন্ত্র রেল-গাড়ী নির্ম্মাণ করা হইবে।

বিধবাবিবাহ—ইন্দোরের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারের একটী বিধবার সহিত ইন্দোরের হাইকোর্টের জজ মিঃ ভি, ভি, কীর্ত্তনীর বিবাহ হইয়াছে। কন্যার নাম সুন্দর বাই যোসী। ইনি বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের কাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেই আজকাল স্বীকার করেন যে, ভারত-মহিলারা নারীর উপযুক্ত জগতে যত কাজ আছে, সে সকল হইতে একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আবার ভারতবর্ষীয়া নারী-দের জীবন অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া বঙ্গীয় যুবকদিগকে অনেক সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। কিন্তু এখনকার মাতা ও বালিকারা নিজেই নিজেদের দুঃখময় অবস্থার জন্য যেরূপ হতাশ ও কাতর, আর ঐরূপ অলস ও কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতে যেমন অনিচ্ছুক, তেমন আর কেহই নহে। সকলেই কাজ করিতে উন্মত, শিখিতে মনোযোগী, অথচ কি কাজ করিবেন তাহা জানেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে কোন উপ-যুক্ত কাজের পথ দেখাইয়া দিলে, কালে তাঁহারা অভ্যাস বশতঃ উহা ধরিয়া নিজেরাই নির্ভয়ে ও নিরাপদে চলিবেন, এরূপ আশা হয়।

সেই আশা পূরণের অভিপ্রায়ে ও বঙ্গ-বালাদিগকে প্রথম পথ দেখাইয়া সাহায্য

করিবার উদ্দেশে আমি এই 'স্ত্রীলোকের কাজ' নামক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যে সকল মাতা বা কন্যা যথেষ্ট ধনবতী, তাঁহাদিগকে, পরের জন্য সামান্য কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে আনন্দভোগ ও পরোপকার একত্র করা যাইতে পারে, তাহা দেখাইবার সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি। আর যে সকল গৃহস্থ রমণী নিজের হাতে সংসারের কাজ করেন, বা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগকেও গোটাকতক সদুপায় বলিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মতে, নিজ নিজ গৃহকে কি প্রকারে উজ্জ্বল, প্রফুল্ল ও সুশৃঙ্খল রাখিতে হয়, তাহা প্রত্যেক রমণী ও গৃহিণীর জানা উচিত। আর নিজ সংসারকে সর্ব্বদা শান্তিময় ও সুখপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিলে উহাতেই নারীজাতির জ্ঞান বুদ্ধি ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। কোন স্ত্রীলোক ঘরের কাজকে হীন কর্ম্ম মনে করিলে আমি বাস্তবিক অত্যন্ত দুঃখ পাই। আমরা আজকাল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আচার ব্যবহার হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছি, আর আমরা যে পথ ধরিয়া চলিতেছি তাহা অধিকতর উন্নত ও সুখ-প্রদ হইবে, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু ঐ নূতন পথ যদি বালিকাদিগকে গৃহকর্ম্মে অবহেলা করিতে শিখায়, তাহা হইলে উহা উন্নতির পরিবর্ত্তে আমাদিগকে অধোদিকে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

নারীজাতির শিক্ষাপথে গৃহকর্ম্মকে উহার উপযুক্ত স্থানে দেখিবার ইচ্ছা করিলেও, কোন স্ত্রীলোকের সমস্ত সময় ও মন কেবল নিজ পরিবারের উপরই সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকে, এ প্রকার শিক্ষা দেওয়া বা বুঝানও আমার উদ্দেশ্য নহে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেক মানব ও পরিবারের আদর্শ স্বরূপ, সেজন্য আমাদের গৃহস্থিত পুত্র কন্যা ভাই বোনদের ন্যায় পরিবারের বহিঃস্থিত ভ্রাতাভগিনীদের কাছেও আমরা কতক পরিমাণে দায়ী। কিন্তু জগতের ঐ কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইলে আমরা এক মহাবিভ্রাটে পড়ি। কেননা, দাতব্যের দ্বারা পরের দুঃখ দূর করা ও যথার্থ নিঃস্বদিগকে সাহায্য করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উহা খুব সাবধানে করা উচিত। আমাদের সতর্কতার অভাব বশতঃই ভারতবর্ষে এত অসংখ্য কপট ভিখারী ও ভণ্ড অনাথের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ সৎ-কর্ম্মের বাসনা খেয়াল বা খামকা ইচ্ছা-প্রযুক্ত হইলে চলিবে না; অপরের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে যাইলে, সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে হিতাহিত বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক। সেই কারণে, ঐ বিষয়ে স্ত্রী-লোকেরা যাহাতে অপকারের আশঙ্কা ব্যতীত যথার্থ পরোপকার করিতে পারেন, সেরূপ উপায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। 'আমোদের কর্ম্মে' আমি বালিকাদিগকে এরূপ কাজে মনোযোগ দিতে বলিয়াছি, যাহাতে অভ্যাস ও কার্য্যতঃ জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের আস্থাও বাড়িতে থাকিবে।

অবশ্য, স্ত্রীলোকের কাজে, আমি দুই চারিটা ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছি, ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা দ্বারা উহার সুফল ফলিবে, এই রূপ আমার আশা।

আয় মা বোন! আয় মেয়ে যত,
গৃহকর্ম্মে সদা থাকি অনুরত।
কে বলে ঘরের কাজ অতি হীন?
কে বলে জীবন উহাতে মলিন?
সংসারের সম কি আছে জগতে,
পারে যাহা উর্দ্ধে নারীরে তুলিতে?
অই পিতা মাতা ঈশ্বরের ছায়া,
অই ভাই বোন মমতার কায়া,
অই স্বামী তোর প্রেম-মূর্ত্তিমান্,
অই শিশু তোর স্বরগের দান।
এ সব দেবতা যে আলয়ে ঘুরে
সে পুরী কি কভু নীচ হ'তে পারে?
তাই গৃহকাজে নারীর জীবনে
শুভ আশীর্ব্বাদ পড়ে প্রতিক্ষণে।
ক্রমে এ সংসারে জগতজননী
হয়ে উর্দ্ধপানে উঠে যে রমণী।
হেন মহাকাজে তবে কেন হেলা?
আয় মাতা, বোন, মেয়ে, এই বেলা।
দেখাই সবারে নারীর মহিমা,
বুঝাই সবারে নারীর গরিমা,
সংসারের কাজ কত যে মহান্,
কত শ্রেষ্ঠ তাহে রমণীর প্রাণ।

ভারত-ললনা।

সেকাল ও একাল।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে রমণীর স্থান অতি উচ্চ। পাশ্চাত্য দেশ রমণীকে সঙ্গিনী বা ভগিনীরূপে দেখিয়া, আপনার পার্শ্বে স্থান দিয়াছেন। আর্য্যভারত চিরদিন নারীকে মাতৃরূপে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

আত্মা এই আখ্যাটী তন্ত্রেতে নারীকে প্রদত্ত হইয়াছে। "যত্র নারী তত্র গৌরী" ইহা একটী প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক উক্তি। চাণক্য পণ্ডিত নীতি-উপদেশমধ্যে "মাতৃবৎ পরদারেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ" বলিয়া প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান কি প্রকার ও কত উচ্চ ছিল, তাহা সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উপনিষদে ব্রহ্মকে রসময়রূপে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই রসময় আনন্দময়ের প্রেমের অপূর্ব্ব, অজস্র স্ফূর্ত্তি বর্ণন করিতে গিয়া উপনিষৎ বলিয়াছেন "মাতেব পুমান্ ব্রহ্মস্ব।" এই বিশাল, অনন্ত, অপূর্ব্ব, বিচিত্র, সর্ব্বরসঘন, সর্ব্বসৌন্দর্য্যরাশি, নিত্য-নবলীলাপূর্ণ, অতিশোভন বিশ্বগ্রন্থের রচয়িতার অনুপম প্রেমসম্পৎ প্রকটিত করিতে যাইয়া বেদান্ত ব্রহ্মে মাতৃস্নেহ আরোপ করিলেন, কারণ নারী-হৃদয়ের বাৎসল্যধারা অপেক্ষা রসসৌষ্ঠব ও ভাব-সৌন্দর্য্য আর অধিক দূর গমন করিতে পারে না। ইহা কি রমণীকুলের পক্ষে কম

গৌরবের বিষয় ? বেদ বেদান্ত বলিয়াছেন যে, নারী গর্ভস্থ ভ্রূণকে যে প্রকার স্নেহের সহিত রক্ষা করেন, ব্রহ্মা আমাদিগকে সেই প্রকার স্নেহের সহিত সৃষ্টি ও পালন করেন।

হিন্দুদিগের পুরাণে ব্রহ্মের পুরুষত্বের সম্পূরণের নিমিত্ত প্রকৃতির নারীত্বের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং সেই রসময়ের আহ্লাদিনী শক্তিকে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। হিন্দুগণের তন্ত্রে রমণীকে আত্মা শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিতের লক্ষণের মধ্যে নারীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করা প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মনু প্রভৃতি হিন্দুস্মৃতির মধ্যে নানা স্থানে নারীর প্রতি গভীর ও অকপট ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যে গৃহে নারী পূজিতা হন, সেই গৃহের প্রতি লক্ষ্মী প্রসন্না হন, এই প্রকার ভাব বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। যে গৃহে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় না, সে গৃহ সুখ সম্পদে হীন।

প্রাচীন ভারতে নারীর প্রতি অসীম, প্রগাঢ়, অকপট ভক্তি প্রদর্শিত হইবার প্রধান কারণ প্রাচীন কালের ভারতমহিলাগণের চিত্ত ও চরিত্রের মহীয়সী শক্তি।

ঋগ্বেদ সকল বেদের প্রধান। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে বেদ প্রধান শাস্ত্র। সেই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ৮টী মন্ত্র অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী হিন্দুরমণী কর্ত্তৃক রচিত। এই অষ্ট মন্ত্র দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীনকালে, আধুনিক চণ্ডীর পরিবর্ত্তে এই দেবীসূক্তপাঠের প্রথা প্রচলিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের "চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রকরণ বাক্ প্রণীত এই অষ্ট মন্ত্রের প্রতিধ্বনিমাত্র। চণ্ডীপাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই বাক্-দেবীর গৌরব হিন্দুমাত্রেরই গৃহে গৃহে নিত্য ঘোষিত হইতেছে।

সংসার জানে না যে, অদ্বৈতবাদ ও সতীত্ব এই বাক্-দেবীর রমণীহৃদয় হইতে উৎসারিত জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির মুক্তিপ্রদায়িনী জাহ্নবীস্রোতের বিভিন্ন ধারা মাত্র। যদিও পুরুষপ্রধান সংসার অদ্বৈতবাদকে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচার করিয়াছে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মূলে বাক্ দেবীই একেশ্বরবাদের সৃষ্টিকর্ত্রী। "সোঽহং, ওঁ তৎসৎ; তত্ত্বমসি, অহংব্রহ্মাস্মি, ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি-একেশ্বরবাদসূচক মন্ত্র বাক্‌দেবীর রচিত।

বাক্ রচিত অদ্বৈতবাদমূলক মন্ত্রের অর্থ এই, "আমি রুদ্র, বসু, এই সকলের আত্মার স্বরূপে বিচরণ করি। আমি উভয় মিত্র ও বরুণ। ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করি। আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বরী। আমাতে ভূরি ভূরি প্রাণী প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। জীব যে দর্শন করে, প্রাণ ধারণ করে, অন্নাহার করে, তাহা আমারই দ্বারা সম্পাদিত। আমিই দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সেবিত। আমিই সমস্ত কামনা করিয়া থাকি। আমিই লোককে স্রষ্টা, ঋষি ও

বৃদ্ধিশালী করিতে পারি। আমিই ভক্তগণের উপকারার্থ তাহাদের বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করি। আমিই স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি। এই ভূলোকের উপরিস্থিত আকাশকে আমিই সৃজন করি। বায়ু যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে সঞ্চরিত হয় সেইরূপ সমস্ত ভুবনের প্রসবিত্রী আমি নিজেই নিজ ইচ্ছানুসারে তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করি। আমারই মহিমাবলে এতাবৎ সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে।"

ঋগ্বেদসংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টবিংশ-সূক্ত-রচয়িত্রী অত্রি-মুনির গোত্রজাতা বিশ্ববারার নাম ভারত-গগনে তদ্রচিত ঋক্-অষ্টকের ধ্বনির সহিত গীত হইবে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া নারী-হৃদয়ের ভাব, সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৫৩ সূক্তের ঋক্পঞ্চক রচয়িত্রী ইন্দ্রমাতৃগণ কশ্যপ ঋষির ঔরস এবং অদিতি দেবীর গর্ভকে ইতিহাসে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ভারতগগন এখনও সেই মহান্ গৌরবধ্বনিতে নিত্য নিনাদিত।

অত্রি-বংশীয়া অপালা, বিশ্ববারার ন্যায়, ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৯১ সূক্তের আটটি ঋক্ প্রণয়ন করেন।

ঋগ্বেদসংহিতার চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্ ইন্দ্রমাতা অদিতির রচিত।

এই ঋগ্বেদের দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, এবং একাদশ ঋক্গুলি এবং ১৫২ সূক্তের পাঁচটী ঋক্ যমীনাম্নী প্রসিদ্ধা রমণী কর্ত্তৃক রচিত। অগস্ত্য মুনির পত্নী, বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় ঋক্ রচনা করেন। তিনি অত্যন্ত স্বামিপরায়ণা ও ভক্তিমতী ছিলেন।

ভাবযব্য রাজার মহিষী স্বনয়-জননী রোমশা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তের সপ্তম ঋক্ রচনা করেন।

অপ্সরাকন্যা উর্ব্বসী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের সাতটী ঋকে উর্ব্বশী ও পুরূরবার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

এই বৈদিক কালের নারীচরিত্রের অতুলন শোভায় জগতের রমণীকুল গৌরবান্বিত। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি পতন-শীল হিন্দুজাতির স্মার্ত্ত-রচিত "স্ত্রী শূদ্র-দ্বিজ বন্ধূনাং নাধীয়তাম্" শ্লোকের বলে নারী-জাতিকে জ্ঞান ও বেদপাঠ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাঁহারা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন যে, যে জ্ঞানের জন্য ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নরগণ মহিমান্বিত, সেই জ্ঞান ও বেদ বিষ্ণুচরণনিঃসৃতা, মুক্তি-প্রদায়িনী জাহ্নবীধারার ন্যায়, নারীহৃদয়-নিঃসৃত অমৃতধারা। যে বেদে পুরুষ ব্যতীত নারীর অধিকার নাই, স্মার্ত্তগণ বলিতেছেন, সেই বেদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সূক্তেরও রচয়িতা নারী।

বেদের শেষাংশ বেদান্ত। বেদান্তের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ সর্ব্বপ্রধান।

বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জনকরাজার সভাপতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী অতীব ব্রহ্মপরায়ণা ছিলেন। বাণপ্রস্থ অবলম্বনকালে, মহর্ষি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে নিকটে ডাকিয়া সংসারের তৈজস পত্র বিভাগ করিয়া লইতে বলিলেন। তাহাতে মৈত্রেয়ী এই প্রশ্ন করেন যে "যদি এই পৃথিবী এই প্রকার তৈজসপত্রে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলেই কি আমি নির্ব্বাণ অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব? মহর্ষি বলিলেন, "না।" মৈত্রেয়ী বলিলেন—

"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাং" অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ না করিব, তাহা লইয়া আমি কি করিব? মৈত্রেয়ী দেবীর বাক্যের প্রতিধ্বনিই মহর্ষি ঈশার "তোমার আত্মা হারাইয়া সমুদায় সংসার প্রাপ্ত হইলে কি লাভ হইবে?" এই উক্তিতে শ্রবণ করা যায়। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মান্বেষী ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সেই সুদূর অতীত কালে হিমালয়ের পাদদেশস্থ বনভূমিকে মুখরিত করিয়া মৈত্রেয়ীর বামাকণ্ঠ "ওঁ। অসতোমা সদ্গময়। তমসোমা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং," এই সামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্রষ্টার চরণে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিল।

সেই মৈত্রেয়ী দেবীর সমসাময়িক বচক্নুমুনিকন্যা গার্গী রমণীকুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। কেবল রমণীকুল কেন, ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জনকরাজার সভাপণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের পরীক্ষকরূপে রাজদরবারে ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা এবং রমণীকুলের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ষোল বৎসর মাত্র বয়স।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবমনের নিবিড়তমোরাশিনাশী সাংখ্যদর্শন যে কপিল মুনির সহস্রারবিগলিত মুক্তি-ত্রিবেণীধারারূপে জগতে কল্যাণ বিতরণ করিয়াছে, সেই অমৃতস্রোতের উৎসভূমি কপিলমাতা দেবহুতি। ইনি রাজা স্বায়ম্ভুব মুনির কন্যা। ইঁহার মাতার নাম শতরূপা। দেবহুতি রাজকন্যা হইয়াও পিতৃগৃহের অতুল সম্পদ্ বর্জ্জনপূর্ব্বক জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত কর্দ্দমমুনির সহধর্ম্মিণী হইয়া বনবাসিনী হইয়াছিলেন। এই দেবহুতির কন্যা অরুন্ধতী ও অনসূয়া ভারতে প্রসিদ্ধা। বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর পাতিব্রত্য জগতে প্রসিদ্ধ ও আদর্শস্থানীয়। অত্রি ঋষির পত্নী অনসূয়াও অরুন্ধতীর ন্যায় অশেষগুণশালিনী। গন্ধর্ব্বকন্যা মদালসা ঋতধ্বজ রাজার পত্নী। তিনি জ্ঞান ও ভক্তিতে জগতের পূজনীয়া এবং অলর্ক, বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নামক পুত্রচতুষ্টয়কে সদুপদেশ দ্বারা ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও বিরাগী করিয়াছিলেন। পুরাণে এ বিষয়ে সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে।

এই পৌরাণিক যুগের রমণীচিত্রের পরেই, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দী মণ্ডনমিশ্রের সহধর্ম্মিণী ভারতী দেবী, ভাস্করা-

চার্য্যকন্যা জ্যোতিষশাস্ত্রজ্যোতিঃ লীলাবতী, বাস্তুবিদ্যানিপুণা ভোজরাজমহিষী ভানুমতী, সুপ্রসিদ্ধা জ্যোতিষশাস্ত্রনিপুণা মিহির-পত্নী খনা, প্রভৃতির প্রতিভারশ্মি ভারতগগনকে আলোকপ্রবাহে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীরত্ন মানবেতিহাসকে অতি শোভান্বিত করিয়াছে। এই সমুদায় বৈদিক বৈদান্তিক পৌরাণিক ও তৎপরবর্ত্তী কালের ভারতীয় ললনাকুলের প্রতি নেত্রপাত করিলে বিস্ময় ও অনুতাপে পরিপূর্ণ হইতে হয়। যে দেশে রমণীকুলের প্রাচীন ইতিহাস এতই গৌরবজনক, সেই প্রাচীন ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় রমণীগণের যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, পর্য্যালোচনা করিলে শোকে ও দুঃখে, লজ্জায় এবং ঘৃণায় মুহ্যমান এবং ম্রিয়মাণ হইতে হয়।

পূর্ব্বকালে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভারতললনার পুরুষের সহিত সমান অধিকার ছিল। আধুনিক হিন্দু স্মৃতি, "স্ত্রী শূদ্রকে পড়াইতে নাই" বলিয়া জ্ঞান বিষয়ে নারীকে কতই হীন করিয়াছে, নিম্নলিখিত ১৯০১ সালের লোকগণনার সংখ্যা অবলোকন করিলেই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। লোকসংখ্যা—২৯৩,৪১৪,৯০৬। পুরুষসংখ্যা—১৪৯,৫৪২,১০৬। নারীসংখ্যা—১৪৩, ৯৭২, ৮০০। অনক্ষর মোট—২৮৭,৭২৮,৪৮৫। তন্মধ্যে পুরুষসংখ্যা—১৪৪,৭৫২,৪২৬; নারী—১৪২,৯৭৬,৪৫৯। শিক্ষিত মোট—১৫,৬৮৬,৪২১। তন্মধ্যে পুরুষসংখ্যা—১৪,৯০,৬০৮০, নারীসংখ্যা—৯৯৬,৩৪১।

বর্ত্তমান ভারতে শতকরা দশজন পুরুষ লিখিতে পাড়তে জানে এবং স্ত্রী শতকরা একজনেরও কম, আধ জনের কিছু উপর (৬৯৪) লিখিতে পড়িতে জানে। ইহাই আবার ইংরাজপ্রবর্ত্তিত শিক্ষার গুণে। জ্ঞানবুদ্ধিতে ভারতললনার এই বর্ত্তমান অবস্থা। গর্ভবাস হইতে আরম্ভ করিয়া দশ পনের বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষীয়া বালিকাদের বিবাহ হয়। এই অকালবিবাহ যেমন ভারতীয় নরনারীকে মনুষ্যত্বহীন, জ্ঞানহীন ও অসহায় করিতেছে, এমন আর কিছুই নহে। শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকালবিবাহ অসময়ে বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যাঘাত করে। জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, হীন হইলে কি প্রকারে ভারতীয়া রমণীগণ প্রাচীন গৌরবান্বিত অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে ?

রমণীগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে হীন হইলে কি প্রকারেই বা তাহাদের সন্তানগণ বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্মে সংসারে উন্নতি লাভ করিবে ? যদি আমাদিগকে জ্ঞানধর্ম্মাদিতে উন্নত হইতে হয়, যদি ভারতকে পূর্ব্ব গৌরবের অবস্থায় উন্নত করিতে হয়, তবে নারীকুলকে উন্নত ও জ্ঞান, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যপ্রসূত বলে প্রাচীন ভারতের রমণীকুলের সমকক্ষ করিতে হইবে ; কারণ, নারীর উন্নতিতে পুরুষের উন্নতি ও নারীর অবনতিতে পুরুষের অবনতি। নারীর

অবনতিতে পুরুষের উন্নতি ও নারীর উন্নতিতে পুরুষের অবনতি অসম্ভব। নারী ও পুরুষের উন্নতি ও অবনতি একই সূত্রে গ্রথিত।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার উন্নতি সাধনের উপায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় গৃহশিক্ষা। সকলেই জানেন কেবল মৌখিক শিক্ষা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা। একটী শিশুর কথা মনে হয়। তাহার বয়স দুই বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে তাহার দাদা বাবুর দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুন্দর ও অতি মধুর-ভাবে "বাজ রে হৃদয়-বীণে অবিশ্রান্ত হরি বলে, নাচ ওরে আত্মা মামা (মম) সেই সঙ্গে তালে তালে" এই গানটী, ছোট ছোট পা দুখানি মেলিয়া, গম্ভীর ভাবে গায় ও সকলকে গাহিতে বলে। এই শিশুটী যেরূপ শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা। কিন্তু সকলেই কি, বিশেষতঃ রমণীরা কি এইরূপ শিক্ষা পান? আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কি প্রকারে গৃহে অবকাশের সময়, এমন কি কার্য্যের সময়ও অতিবাহিত করেন ভাবুন দেখি। অনেকেই হয়ত তাস পাশা খেলায়, অসার অহিতজনক কথাবার্ত্তায় বা আলস্যে সময় কাটান। তাঁহাদের রুচি অতি কলুষিত। অবকাশের সময় তাঁহারা যে সঙ্গীতাদি করেন বা শুনেন, তাহা এত ঘৃণিত যে কোনও ভদ্র-লোক শুনিলে কর্ণে হস্ত না দিয়া থাকিতে পারেন না। এদিকে আবার অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া দেখুন, হয়ত অধিকাংশ মহিলাগণও "বাবুদের" পদবী অনুসরণ করিয়া ঐরূপেই সময় কাটান। তাঁহারা বিবাহাদি ও পরনিন্দার কথা কহিয়া, বা তাসের "চব্বিশ প্রহরি" বা অভদ্র গান করিয়া সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ আবার হয়ত সময় কাটাইবার জন্য অন্য ভাল বিষয়ের অভাবে অশ্লীল পুস্তক পাঠ ও আবৃত্তি করেন। ইহার কুফল যে কত কে বলিতে পারে?

সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, বাবুরা এই সকল পুস্তক ও জঘন্য অশ্লীল গান তাঁহাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকেও দেন। ইহা অমূলক কথা নহে—অনেক বার দেখিয়াছি, তজ্জন্যই বলিলাম। ঐ সকল বিষয় লইয়া থাকিলে যেরূপ চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ ও নীতিশিক্ষা হয়, তাহা কাহা-কেও বলিতে হইবে না। কু-পুস্তক পাঠ ও কু-বিষয়ের আলোচনার যে কি ভয়ানক কুফল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গৃহের কর্ত্তা ও বয়স্থাদের নিকট হইতেই তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ এইরূপ সুন্দর শিক্ষালাভ করে, ইহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত হইতেছে।

বাবুদের নিকট হইতে অন্তঃপুরবাসিনীগণ, ও উভয়ের নিকট হইতে শিশু সন্তানেরা এই শিক্ষা লাভ করে! এইরূপে সমাজ হইতে নীতি ও সদ্‌গুণসকল দূরে পলায়ন করে ও সমাজ ঘুণদষ্ট বংশের ন্যায় হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই বাঙ্গালী এত ঘৃণিত। অতএব প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ নিজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মহিলাদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ বলিয়া সর্ব্বদা মনে রাখেন। স্ত্রীলোকদিগের যে সকল দোষ দেখা যায়, তাহার জন্য তাঁহাদিগকেই বা কেমন করিয়া দোষ দেওয়া যায়? আলস্য পাপ ও অমঙ্গলজনক। যদি সদালাপে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা কোন সুকার্য্যে সময় অতিবাহিত না করিলেই মনুষ্য অকর্ম্মণ্য ও নীচ হইয়া যায়, তবে স্ত্রীলোকেরাই বা হইবেন না কেন? প্রত্যেক পরিবারের পুরুষদের সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী, সদালাপী ও প্রার্থনাশীল হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ, তাঁহাদের নিকট হইতে রমণীরা ও রমণীদিগের নিকট হইতে শিশু সন্তানেরা শিক্ষা লাভ করে। আমরা সকল বিষয়েই দৃষ্টান্ত হইতে অধিক শিক্ষা করি। অতএব যখন রমণীগণের শিক্ষার উপর পারিবারিক ও সামাজিক সুখ ও উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের শিক্ষা বিষয়ে সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

নীতি ও বিদ্যাশিক্ষা অনেক পরিমাণে এক প্রকারেই প্রদত্ত হয়, এবং পুস্তক দ্বারা এই উভয়ই হইতে পারে। বিদ্যাপেক্ষা নীতিবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা না হইলে বিদ্যা লইয়া কি হইবে? মনুষ্যকে নিজের নীচ ও পশুভাবকে জয় করিতে হইলে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার সাহায্য আবশ্যক। এই শিক্ষা দ্বারা যে কেবল নিজের ও পরিবার বিশেষেরই উপকার হয় এমন নহে, সমাজেরও অনেক উপকার হয়। ধর্ম্মশিক্ষার বিষয় অধিক না বলিয়া নবদ্বীপের শচীনন্দন যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। "নামে রুচি, জীবে দয়া।" ইহাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; ইহা শিক্ষা করিলেই হইল। ইহাই সকল ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার মূলমন্ত্র হওয়া আবশ্যক। সকলেই ধনী বা পণ্ডিত না হইতে পারেন কিন্তু সকলেরই সচ্চরিত্র ও সৎপথাবলম্বী হওয়া উচিত।

এতদ্ব্যতীত সদ্ব্যবহার ও হৃদয়ের ভাব সকল সুপথে পরিচালিত করিতে শিক্ষা করাও নিতান্ত প্রয়োজন। একটী ইংরাজী কথা আছে, তাহার মর্ম্ম এই—"সদাচারই মানুষকে মানুষ করে।" সকলেই হয়ত দেখিয়াছেন, আমাদের কর্কশ ব্যবহার অন্যের প্রাণে কত ব্যথা দেয়। হয়ত কোন সুপণ্ডিত স্বদেশহিতৈষী লোকেরও ব্যবহার কখন কখন এত কর্কশ হয় যে, তাহাতে অনেকেই মনে কষ্ট পায়। আমরা যে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় বলিলাম, তাহা বিদ্যালয়ে বালক ও যুবকদিগকে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার মত নহে; তাহার মত হয়, ইহাও কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় কিছু কিছু বলা হইয়াছে। এখন ব্যায়ামের বিষয় কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। অনেকে হয়ত স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম করিতে বলিলে উপহাস করিবেন, কিন্তু লোকের মত ভিন্ন ভিন্ন, আমারও সেইরূপ। ব্যায়াম করিলে শরীর সবল হয় ও দেহের যন্ত্র সকল অধিক পরিমাণে কার্য্য করে। ইহাতে প্রত্যেক অঙ্গে রক্ত সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করে। ব্যায়াম করিলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয় এবং তদ্দ্বারা বায়ুতে শরীরের পুষ্টিকারী যে উপকরণ আছে, তাহা অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে এবং ঘর্ম্মাদিরূপে শরীরস্থ দূষিত পদার্থ সকল বাহির হইয়া যায়। ব্যায়াম সহজে রোগ আসিতে দেয় না এবং রোগ হইলেও শীঘ্র আরোগ্যের সহায়তা করে। অবরোধপ্রথা বশতঃ ভ্রমণাদি এদেশীয় মহিলাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাঁহাদের পক্ষে "ডাম্বেল" লইয়া বা অন্য কোন প্রকারে ব্যায়াম করা আবশ্যক। অল্প বয়সেই তাঁহাদের ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করা উচিত। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল ব্যায়ামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়।

ব্যায়ামের সময় প্রফুল্ল মন ও সুস্থ শরীর থাকা আবশ্যক। এইরূপে ব্যায়াম করিতে পারিলে মহিলাগণ সবলা হইয়া জীবনে অধিক সুখানুভব করিবেন এবং তাঁহাদের সন্তানাদিও সবল ও সুস্থ হইবে।

আর দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধটী শেষ করিব। রমণীদের বিবাহ হইলেই অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদের শিক্ষা সাঙ্গ হইতে দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন, স্ত্রীলোকের বিজ্ঞান শিক্ষা বা অধিক লেখা পড়ার আবশ্যক কি? আপন স্বামীকে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। নানা কারণে ও ভূরি ভূরি বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুরোধে বালিকাদের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। এত দিন পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকেরা রমণীদিগকে ভোগের বস্তু ও বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিবার সামগ্রী মনে করিত। কিন্তু তাঁহারা যে মনুষ্যের জীবনের সঙ্গিনী এবং পুরুষের জীবনের যেমন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, তাঁহাদেরও জীবনের সেইরূপ মহৎ বা তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে এ ভাব আমাদের মধ্যে ছিল না। আজ কাল ঈশ্বরের কৃপায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে রমণীদিগের অনেক উন্নতি হইতেছে। এক্ষণে তাঁহারা ন্যায্য পদ লাভ করিতেছেন। ইহাঁদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিস্তর কল্যাণ সাধিত হইবে।

হৃদয়ের বৃত্তি বিষয়ে নারীগণ পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টা ধাত্রীগণ নিজ নিজ সন্তান সন্ততি ও প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ ও প্রেম বিতরণ করিয়া এবং আপনাদের স্বাভাবিক দয়া দ্বারা চালিত হইয়া মনুষ্য-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া

থাকেন। আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন তাঁহাদেরই দ্বারা হইবে। তাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়া অনেক বিষয়ে জীবনের কর্ত্তব্য সকল আমাদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইলে আমদের সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। আমেরিকা ইউরোপ মহাদেশে রমণীগণ শিক্ষালাভ করিয়া কত কার্য্য করিতেছেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। অন্য দেশের কথাই বা বলিবার প্রয়োজন কি? এদেশের সুশিক্ষিত রমণীগণ কি করিতেছেন দেখিলেই যথেষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক লজ্জা প্রযুক্ত বরং অসহ্য পীড়া নীরবে সহ্য করেন, তথাপি তাহার প্রতিকারার্থ পুরুষ চিকিৎসকদের সাহায্য লইতে অনিচ্ছুক। এ দেশস্থ নারীদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া একজন রমণী এই অভাব দূর করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন। কোন শিক্ষিত লোকের নিকট ইঁহার নাম অবিদিত নাই। বিবি লেভিটনাম্নী আমেরিকাবাসিনী ভদ্র মহিলা মিতাচারিদলভুক্তা লক্ষ লক্ষ রমণীর মাদক সেবন বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এক নূতন "সুসমাচার" দেশে দেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই হতভাগ্য দেশে আসিয়াছিলেন। এইরূপ রমণীগণ নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে পরহিতার্থে কতদূর আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, ও নিজ পরিজনবর্গ ছাড়িয়া দেশ বিদেশে সমুদ্র পার হইয়া গিয়া কত অজ্ঞাত জাতির মধ্যে স্বজন ও স্বদেশ হইতে বহু দূরে বিশ্বজনহিতব্রতে দেহ মন উৎসর্গ করিয়া পরিশ্রম করিতেছেন. ভাবিলে মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের বিশ্বাস এদেশীয় স্ত্রীলোকগণও কালে বিজ্ঞান দর্শনাদিতে শিক্ষালাভ করিয়া অন্যদেশীয়া নারীদিগের সমকক্ষ হইবেন। এখন যেমন ইঁহারা অন্যের দৃষ্টান্তে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া সমাজের নানা কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনুন্নত বিদেশীয় রমণীগণও সেইরূপ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক উপকার লাভ করিবেন।

এতদিন এদেশীয় রমণীগণ সামাজিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না ও শিক্ষাও পাইতেন না; কিন্তু এক্ষণে এদেশের লোকে আপনাদের ভ্রম বুঝিয়াছে ও এখন রমাবাই, আনন্দ বাই, চন্দ্রমুখী প্রভৃতির মত রমণীর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে গণিত জ্যোতিষ দর্শনাদিতেও ভারত মহিলাগণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কালিদাস ভাষাজ্ঞান ও কবিত্বে একনারীর নিকট পরাস্ত হইয়া লজ্জা পাইয়াছিলেন।

আশা হয় রমণীদের গৌরবের দিন পুনঃ আসিবে ও প্রতি পরিবারে নারীদিগের সুশিক্ষার ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পিতৃভক্তি।

"মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।"

গগনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও উচ্চতর স্থানে যাঁহার পবিত্র আসন, যিনি পরম-গুরু ও স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীদেবীরও পূজ্যতম দেবতা, যিনি নিরাশ্রয় বাল্য-জীবনের আশ্রয়, এবং যে স্নেহময় পিতৃদেবের অসীম অপরিমেয় ও অতুলনীয় স্নেহে আহার, বিহার, সাজসজ্জা, বিদ্যা-শিক্ষাদি নানাবিধ মঙ্গললাভ করিয়া আজ আমরা জগতে মানব মানবী বলিয়া পরিচিত হইতেছি, সেই মঙ্গলময় প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি যে কি প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। এমন কি, আমার এই ক্ষীণ মস্তিষ্ক যে তাহা ধারণা করিতে নিতান্ত অক্ষম একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পিতা অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া নিজের ক্লেশের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সন্তানকে সুখী, ধনী, মানী, জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ ও যশোগৌরবে বিভূষিত দেখিবার জন্য আত্মহারা হইয়াও আপনাকে সুখী ও ধন্য জ্ঞান করেন, সেই দয়াময়ের প্রতি যে কি প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরা কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। কত পিতা যে অপত্যবিচ্ছেদশোকে নিজ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আমরা মহারাজ দশরথের অকাল মৃত্যুতে উত্তমরূপে অনুভব করিতে পারি। এমন যে স্নেহাধার পিতা, অধম আমরা কি তাঁহার স্নেহরসের এক ধারারও ধার শুধিতে পারি? পিতা যে কি পরম বস্তু, আমরা অন্ধ, আমরা কি তাহা চিনিতে পারি? আমরা কি সেই ভূ-দেবতার মহত্ত্ব অনুসারে তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি? না, তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যথোচিত প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ হই? সেই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করা আমার মত জ্ঞানহীন অবলাজনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। এই পিতৃভক্তিবিষয়ক রচনা কি আমার ন্যায় সামান্য ভক্তিহীনা মানবীর নির্জ্জীব লেখনী প্রকাশ করিতে পারে? পরম ভক্ত না হইলে কি কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়! ভক্তির বলেই ধ্রুব প্রহ্লাদের নিকটে হিংস্র জন্তুগণও শান্তভাব ধারণ করিয়া তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, আর সেই ভক্তি এবং বিশ্বাসের বলেই তাহাদের ঈশ্বরদর্শনলাভ হইয়াছিল। এইরূপ ভক্তিভাবে বিভোর হইয়াই দেবর্ষি নারদ বীণাসংযোগে হরিগুণগাথা গাহিতে গাহিতে আপনার হীনতা ও বীণার শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া

নির্জ্জীব বীণাকে সজীব ভাবিয়া বীণার নিকটে ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিতেছিলেন। বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রভাবেই নারদ সামান্য দাসীপুত্র হইয়াও আজ দেবপুত্র বলিয়া সংসারে পূজিত। বৈষ্ণবেরাও বলিয়া থাকেন "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।" তাই বলি আমরা পিতৃভক্তির বিষয়ে মুখে হাজার বক্তৃতা করি, কিম্বা সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি না কেন "পিতা যে পরম দেবতা," ইহা বিশ্বাস ভিন্ন ও পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ভিন্ন তাহা বোধগম্য হইবার নহে। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ের একত্র সংযোগ ভিন্ন, কেবল বিশ্বাস কিম্বা কেবল ভক্তি দ্বারা যে আমরা সেই পরম পিতাকে পাইতে পারি না, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই আমাদের পূর্ব্বতন সুচতুর আর্য্য ঋষিগণ বিশ্বাসরূপিণী যশোদা ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভে এক কৃষ্ণকে দুই অংশে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব বিশ্বাস ও ভক্তির যোগ ভিন্ন যখন পূর্ণ প্রেমের আবির্ভাব হয় না, তখন আমরা অবিশ্বাসী ভক্তিহীন এবং প্রেমহীন হইয়া প্রেমময় পিতার প্রতি কি প্রকারে ভক্তি প্রদর্শন করিব তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ক্ষুদ্র নগণ্য, আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি পিতৃভক্তি-গাথা প্রকাশ করিতে যে একেবারেই অসমর্থ, তাহা আমরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারি। আমরা অবিশ্বাসী বলিয়াই ত নিয়ত শুনিতে পাই, পিতার ভর্ৎসনায় কত সন্তান আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া মনের দুঃখ দূর করিবার জন্য কত প্রকারে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। যদি আমাদের হৃদয়ে একবিন্দু বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম যে, পিতা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই আমাদিগকে ভর্ৎসনা করেন বা উপযুক্ত শাস্তি দিয়া থাকেন। আমরা অবিশ্বাসী ও অন্ধ বলিয়া নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া মঙ্গলময় পিতাকেই কেবল শাস্তিদাতা ভাবিয়া অশান্তিতে ডুবিয়া মরি। আমাদের এই অন্ধতা ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য ত মহর্ষি বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রভৃতি ভবিষ্যৎবেত্তা মহাপুরুষগণ ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাসে পিতৃভক্তির জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত সকল অঙ্কিত করিয়া নরনারীর অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাম, পরশুরাম, পুরুরাজ, ভীষ্মদেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের পিতৃভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্তে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের ও পুরুরাজের গভীর পিতৃপরায়ণতা, ভীষ্মদেবের অমানুষিক স্বার্থত্যাগ এবং জামদগ্ন্যের অসাধারণ পিতৃ-আজ্ঞা পালন দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মানবের এতাদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে সেই সমস্ত অতীতের কথা আমাদের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য

তাঁহাদের কার্য্যসমূহকে আমরা দেবলীলা বলিয়া বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পরি না। বাস্তবিক যদি আমরা একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত "পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমস্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে, প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" ইহা ভাবিতে পারি, তাহা হইলে পিতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের কোন কার্য্যই অসাধ্য বোধ হয় না। তখন সর্ব্বময় দেবতা পিতার প্রিয়কার্য্যসাধনার্থে জীবন যাউক্ বা থাকুক তাহা জ্ঞান থাকে না; তখন পিতৃ-আজ্ঞা পালনই স্বর্গসুখ মনে হয়। পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানের পক্ষে "এ কার্য্য করিব কি না, ইহাতে আমার মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবে" তাহা চিন্তা করিবার অবসর থাকে না; পিতৃ-আজ্ঞাই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তান বুঝেন যে, পিতাকে প্রীত রাখিতে পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। যদি এই পার্থিব পিতার প্রতি প্রীতিতে সেই বিশ্বপিতার সন্তোষ সাধন হয়, তবে পিতার আদেশ যতই কঠোর হউক না কেন, তাহার গুণাগুণ বিচার না করিয়া সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রে তাহা পালন করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য।

এ স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি কোন পিতার অসাধু কার্য্যই প্রিয় হইয়া থাকে, তবে তাহাও কি দেবাদেশ বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? এরূপ জিজ্ঞাস্যস্থলে বলা আবশ্যক যে, সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পিতার সেই অসাধু ইচ্ছা দূর না হয়, ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় ধীর ও স্থির-ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী যুক্তিপ্রদান দ্বারা পিতার চিত্তের মলিনতা মুছিয়া দেওয়া যে পিতৃভক্ত সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মানব-মাত্রেরই সময়ে সময়ে ভুল, ভ্রান্তি, ভ্রম, প্রমাদ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ধীর মনে এবং সুবিবেচনার সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করা বুদ্ধিমান্ সন্তানের নিতান্ত আবশ্যক। আর পিতৃভক্তি বলিতে সর্ব্বদা পিতাকে ভক্তি করা এবং তাহাতেই পিতৃ-ভক্তি হইল, আমরা তাহা বলিতে পারি না। কিম্বা "পিতরি প্রীতিমাপন্নে" বলিতে কেবল যে কার্য্য করিলে পিতার প্রীতি জন্মে তাহা, ইহাও বুঝিতে পারি না। যাহাতে পিতার ঐহিক ও পারত্রিক প্রীতি বা মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করাকেই আমরা বাস্তব পিতৃভক্তি বলিয়া মনে করি; আর তাহাতেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এক পিতৃভক্তি হইতে সেই সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বময় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন, সুতরাং সন্তানেরও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তানের গুণে পিতার পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।

পিতৃভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ সন্তানের গুণে যে পিতামাতার সদগতি হইতে পারে, কপিলদেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। আর আমাদের দাক্ষায়ণী সতী কেবল পতিসোহাগিনী বলিয়া সর্ব্বত্র পূজনীয়া হইলেও আমরা তাঁহাকে কেবল পতিব্রতা না বলিয়া, পিতৃভক্তির আদর্শ বলিয়াও পূজা করিতে পারি। পিতার প্রতি সন্তানের কতদূর স্নেহ, মমতা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইতে পারে, পিতার ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনের প্রতি, পিতার ধর্ম্মের প্রতি কতদূর দৃষ্টি থাকা সম্ভব, সতীর জীবনীতে আমরা তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। "রাণী ঝি পোষে, কাণা পো পোষে" অনেক পিতামাতার মুখে এই প্রবাদবাক্য শুনিতে পাই। কিন্তু আমাদের পিতৃভক্তিপরায়ণা দেবী সতী দরিদ্রের ঘরণী হইয়াও পিতামাতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি লালসাপূর্ণদৃষ্টিতে দর্শন করিতেন না।

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি। আমার বোধ হয়, যে জীবিতকালে বিশ্বাসের সহিত ভগবানের যেরূপ স্বরূপ বুঝিবে এবং তাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে, সে তাহার মহানিদ্রাতে হয়ত তদনুযায়ী ফল পাইবে। কারণ একজন যাহাকে পাপকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, অন্যে বিশ্বাসের সহিত ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাই বলিয়া সেই বিশ্বাসী অন্যের চক্ষে পাপকার্য্যানুষ্ঠাতা হইলেও কি ভগবৎকৃপা পাইবে না? ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে পাপকার্য্যের উচ্ছেদ সাধন হইবেই হইবে। জ্ঞানময় প্রভু আমাদিগকে জ্ঞানের কণা দিয়া পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণের ক্ষমতা দিয়াছেন। নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাসী হওয়া ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য ধর্ম্মগুলিকে নিন্দা করা ভাল নয়। অধিকন্তু নিজ ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য করিয়া অন্য ধর্ম্মগুলির মহত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিলে মন উন্নত হয় এবং সাম্যবাদী হওয়া যায়। এই জন্যই রাজা রামমোহন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, জগতে হিন্দু ধর্ম্মের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টানগণ বিশ্বাসবলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে জগদ্ব্যাপী করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ এ বিষয়ে অনেক পশ্চাৎপদ ছিলেন। এই জন্যই পূর্ব্বে কত হিন্দু সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গভীরতত্ত্ব বুঝাইবার ধর্ম্মপ্রাণ লোক না পাইয়া এবং খ্রীষ্টানগণের সামাজিক আচার

ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, অজ্ঞানতাহেতু বহু বৎসরের চিরপনের কুসংস্কারগুলির বন্ধন ছেদন করিবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যদি সাহসী, সত্যবাদী, জ্ঞানী মহাত্মা রামমোহনের যথাসময়ে আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে পুরাতন হিন্দু ধর্ম্মের কি দুর্দ্দশা হইত তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মধ্যযুগের পুরাণ অপেক্ষা উপনিষদ যে অধিকতর সারবান্, ইহা সপ্রমাণ করিয়া বিশ্বাসবলেই তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। প্রাণাপেক্ষা ধর্ম্ম ভাল বাসিতেন বলিয়াই খ্রীষ্টানধর্ম্মের অবিশ্রান্ত প্রচার সত্ত্বেও তিনি অধঃপতিত হিন্দুধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব প্রচার করিয়া তৎপ্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত মহাপুরুষগণের অনুকরণ করাই আত্মোন্নতির বিশিষ্ট উপায়। কারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকিলে অনুকরণ করা যাইতে পারে না। মহাপুরুষ যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তদুপদিষ্ট মার্গে যখন বহুলোক শান্তি ও মুক্তি লাভ করিতেছে, তখন তিনি অশ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন না ও তাঁহার উপদেশগুলিও হেয় হইতে পারে না। অধিকন্তু নিজ ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণের অনুকরণ করিতে করিতে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিলে নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি হয়, এবং হৃদয়ও উন্নত হয়। উপনিষদে পড়িয়াছি যে, আমরা অমৃতের অধিকারী; আবার যিশু বলিয়াছেন, "The kingdom of heaven is unto you." ইহাতে কি প্রাচীন উপনিষদকারগণের সর্ব্বতোমুখীন জ্ঞানের জন্য তাঁহাদিগের প্রতি আরও ভক্তি হয় না? যিশুকেও ঋষিকল্প জ্ঞান করা কি আমাদের উচিত নহে? সকল ধর্ম্মের আলোচনায় নিজের ধর্ম্মভাব পুষ্টি লাভ করে এবং সকল মহাপুরুষের জীবনী ভক্তির সহিত আলোচনা করিলে আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল মহাপুরুষের সমস্ত কার্য্যাবলী একজনের অনুকরণীয় হইতে পারে না। একজন মহাপুরুষের কতকগুলি কার্য্য আমার আদর্শ মহাপুরুষের কার্য্যের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে। অতএব আমাদিগের দেশ, কাল, পাত্র, উদ্দেশ্য, বিধেয় প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া কোন মহাপুরুষের প্রতি ভ্রূকুটী প্রদর্শন না করাই শ্রেয়ঃ। যাহা হউক, মনুষ্যসমাজে মহাপুরুষদিগের সমাদর চিরকালই বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার এই ভারতবর্ষে একটু ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ দেখিলেই আমরা তাঁহাকে "ভগবান্" উপাধি দিয়া বসি, এবং কখন কখন জ্ঞানহীন সাধারণ লোকে তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া পূজাদিও করিয়া থাকে। এই অবতার-বাদ হইতেই দাস্য, সখ্য, মধুর প্রভৃতি কতিপয় ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল ভাবের মধুরতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য আমার নাই; কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা পরব্রহ্মকে পিতৃভাবে উপাসনা করিতে আমার ভাল লাগে। মহাপুরুষগণ পরব্রহ্মের অংশবিশেষ বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। যাহা হউক, মহাপুরুষগণকে ভগবান্ বলিয়াই হউক বা ভগবৎকৃপাসম্পন্ন বলিয়াই হউক, চাউল কি অন্ন দিয়া ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের পূজা করান অপেক্ষা, শ্রদ্ধার সহিত নিজেই তাঁহাদের জীবন আলোচনা করা শ্রেয়ঃ। তাহাতে নিজের ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। যদি দলাদলি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিতে হয়, তাহা হইলে যথাযোগ্য মহাপুরুষকেই ভক্তি করিয়া সাধারণ লোককে এই ঘোর অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে সেই সারাৎসারের নাম সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইবে, এবং আমরাও ভ্রাতৃভাবে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিয়াছি বলিয়া আনন্দ অনুভব করিব।

ভগবান্ ও তাঁহার স্বরূপের বিষয় বলিতে গিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মাঝে মাঝে কয়েকটী অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যখন সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম এ জগতের সকল বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন, তখন তাঁহার স্বরূপ কি জড়রাজ্যে কি মনোরাজ্যে, যেখানেই দেখি না কেন, আমাদের জ্ঞানের পরিসর অনুসারে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব। তিনি জ্ঞানময়, সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জ্ঞানরূপে আমাদের মনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি প্রেমময় বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রেমের একটী ক্ষুদ্র কণামাত্র পাইবার জন্য এত প্রয়াসী। তিনি পবিত্রতাময় এবং শান্তিময়, তাই আমরা পবিত্র জীবন লাভ করিয়া তাঁহার শান্তিময় চরণতলে একটু স্থানের ভিখারী। তিনি শাশ্বতং তিনি অভয়ং, তিনি অশোকং, তিনি অদেহং, তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। আমাদের অস্তিত্ব তাঁহারই কৃপা মাত্র। তাই বলি—

"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

বিবাহিত জীবন।

মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্মসাধন। বিবাহ দ্বারা মনুষ্য সেই ধর্ম্মসাধনের সহায়তা লাভ করে। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই বিবাহ এত পবিত্র বলিয়া বর্ণিত হয়। বিবাহ দ্বারা দুইটী অপূর্ণ মানব-আত্মা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং উভয় আত্মা একীভূত হইয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। দম্পতীর প্রেম পবিত্র হইলে, তদুপরি ব্রহ্মাণ্ডপতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা দিন দিন একপ্রাণ হইয়া

ভগবানের পূজায় প্রাণ মন সমর্পণ করেন। বস্তুতঃ, মনুষ্য-জীবনে বিবাহ একটী পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। জীবনে এ কর্ত্তব্যটী সুসাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। এ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে সাধুতা, প্রেম, ক্ষমা, ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হয়। এই গভীর সমস্যার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, এ পবিত্র কার্য্যের জন্য আমরা কতদূর উপযুক্ত হইয়াছি। নম্রতা, সুমিষ্ট ব্যবহার, অকপট ও বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত পত্নী পতির ও পতি পত্নীর জীবনের সংসঙ্গী হইতে পারিবেন কি না, তাহা পূর্ব্বে চিন্তা করিতে হইবে।

পুরুষচরিত্র প্রায়ই স্ত্রীলোক দ্বারা গঠিত। মানব শৈশবে জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হয়, বাল্যে ভগিনীর সহিত ক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে এবং যৌবনে পত্নীকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে লাভ করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়। এই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, মানবের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মভাবের বীজ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীচরিত্র দ্বারা বপন করা হয়। স্নেহময়ী জননীর প্রভাব যেমন বালকের জীবনে কার্য্য করে, প্রেমময়ী ভার্য্যার প্রভাবও সেইরূপ যৌবনে পতির জীবনে কার্য্য করে। পতির হৃদয় যখন পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমে মুগ্ধ হয়, তখনই তাঁহার জীবনের উপর পত্নীর প্রভাব অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, অসদাচারী স্বামী পত্নীর পবিত্র প্রেমের প্রভাবে সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। আবার স্ত্রীর দোষে অনেক সৎপতিকেও বিপথে গমন করিতে দেখা গিয়াছে। বাগ্নারাউল, গ্যারিবল্ডী, নেপোলিয়ন্, আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি জগতের বিখ্যাত মনীষিগণ সকলেই পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই যে, বিপদে ও দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে, পুরুষ অনেক সময় মাতা, ভগ্নী ও পত্নীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রোৎসাহিত হন। সুতরাং এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, আমরা নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্ত্রীচরিত্রের প্রভাব মনুষ্য-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রসব করে। বিষম দারিদ্র্যে ও দুঃখপূর্ণ অবস্থাতে সুনিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি দ্বারা পত্নী পতির কষ্ট দূর করিয়া, প্রেমবিস্তার-পূর্ব্বক তাঁহার সুখ সংবিধান করিতে পারেন। প্রকৃত প্রেমময়ী পত্নী আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, পতির কল্যাণ-চিন্তাতে মগ্ন থাকেন এবং স্বামীর জীবন-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দেন। জ্ঞানবতী ও বিচক্ষণা স্ত্রী স্বামীর সংস্বভাবরূপ বৃক্ষে যখন কোন অনিষ্টকরী বিষলতা জড়িত হইতে দেখেন, তখন তাহা সমূলে উৎ-পাটিত করিবার চেষ্টা করেন।

জ্ঞানিব্যক্তিগণ বলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে এ জগতে উৎকৃষ্ট স্বামী লাভ করাই ভগ-বানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। পুরুষের পক্ষেও এ জগতে সাধ্বী ও গুণবতী স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়া স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। যদি একে

অপরকে সৎপথে আকর্ষণ করিতে নাও পারেন, তথাপি তাঁহারা যে পরস্পরের জীবন-পথের সৎসঙ্গী হইতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সহায়তা করিয়া বিপদ ভঞ্জন, আনন্দ বর্দ্ধন, ও তৎসঙ্গে মানসিক সদ্ভাব সকল সুদৃঢ় করিতে পারেন।

দাম্পত্য জীবনের মঙ্গলের জন্য উভয়কে উভয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকের চরিত্রেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকা সম্ভব। স্বামীর চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ বর্ত্তমান, স্ত্রী তাহা গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীর চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ থাকে, স্বামী তাহার অংশ-ভাগী হইবেন। আমরা অনেকেই স্বীয় অজ্ঞানতা বিষয়ে অন্ধ। দম্পতী পরস্পরে প্রকৃত প্রেমে সম্মিলিত হইয়া, একে অপরের অজ্ঞতা ও তাহার ফলা-ফল প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা দূর করিতে সক্ষম হইবেন। এ কার্য্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার অতিশয় প্রয়োজন। তৈল ব্যতীত আলোক যেমন প্রজ্বলিত হইতে পারে না, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত দাম্পত্যজীবনের কর্ত্তব্যনিচয়ও তদ্রূপ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এইগুলির অভাবে দাম্পত্যজীবনে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। একের ইচ্ছার বিরোধী অন্যে সহসা হইবেন না। যদি তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুভূত না হয়, তাহা হইলে সদ্ভাবে উভয়ে একত্র হইয়া, সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া যতদূর সম্ভব একমতাবলম্বী হইবেন। সংসারের ঘোর অন্ধকারে একজন যদি পথভ্রষ্ট হন, অপরে জ্ঞানপ্রদীপ হস্তে লইয়া পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন। উভয়ে উভয়কে প্রকৃত প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিলে, বাহিরের ক্লেশ ও প্রলোভন হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আত্মীয়-পরিজন, সন্তান সন্ততি বা দাস দাসীর সমীপে উভয়ে কখন মনো-মালিন্য প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে উভয়েরই অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দম্পতী পরস্পর এরূপ ব্যবহার করিবেন যে, তদ্দ্বারা উভয়েরই ক্ষমতা ও সম্মান সর্ব্বদা রক্ষা পায়। গৃহে সুসন্তান দৃষ্ট হইলে, তাহার মূল কারণ এই জানিতে হইবে যে, সেই গৃহের দম্পতী পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সম্মানযুক্ত।

পাতিব্রত্য স্ত্রীচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। পাতিব্রত্যধর্ম্মালঙ্কৃত হইলে স্ত্রীচরিত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সতীত্ব দ্বারা মানবী দেবী বলিয়া অভিহিতা ও পূজিতা হন। পুরাণে অনেক পতিব্রতা ও সাধ্বী নারীর অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হই-য়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সতী প্রভৃতি মহিলারা একমাত্র পতিপরায়ণতা গুণেই জগতের নমস্যা ও পুণ্যশ্লোকা হইয়াছেন। বাস্তবিক যে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর কল্যাণের জন্য নিজদেহের রুধির অকাতরে উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ধন্যা।

দম্পতীযুগল, পরস্পর পরস্পরের

শ্রদ্ধা, প্রীতি ও উৎসাহে প্রীত ও প্রোৎসাহিত হইয়া সাধ্যানুরূপ সংসারধর্ম্ম সমাপন করেন এবং আপনাদের অস্তিত্ব সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের মহাসত্তাতে নিমগ্ন করিয়া কৃতার্থ হন। চরিত্রবতী স্ত্রীর জীবনস্রোত চরিত্রবান্ পতির জীবনস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইলে তাহা জগতে স্বর্গীয় শোভা বিকীর্ণ করে। ফলতঃ, দাম্পত্যজীবন বিশুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হইলে এবং সেই প্রেম পবিত্র প্রেমের আধার ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত হইলে, জীবনের সুখের ও সৌন্দর্য্যের আর অবধি থাকে না। দাম্পত্য-প্রেম-প্রভাবে যদি জগতের কোনও উপকার সাধিত না হইল, পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় সম্পাদিত না হইল এবং উহা বিশুদ্ধ প্রেমের জলধিতে গিয়া না মিশিল, তবে দাম্পত্যজীবন বৃথা।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্ত, পূর্ণিয়া।

মার্‌সি মারভিল।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। কিন্তু লণ্ডন নগরীর জনকোলাহল তখনও মন্দীভূত হয় নাই। সেই সময়ে একজন পরিণতবয়স্ক শীর্ণকায় ইংরাজ পার্শ্বস্থিতা একটী সুন্দরী যুবতীর হস্তের উপর ভর দিয়া লণ্ডনের আর্ট গ্যালারীর একখানি চিত্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরনয়নে তাহা দর্শন করিতেছিলেন। ইহা উত্তরমেরু প্রদেশস্থ সমুদ্রের হিমশিলায় আবদ্ধ একখানি জাহাজের চিত্র। এই আবদ্ধ জাহাজখানির ডেকের উপর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ নরাস্থিসমূহ ও তদ্ভক্ষণে নিরত উত্তরমেরুবাসী ফেরুপালদল এবং জাহাজের চতুর্দ্দিকস্থ সাগরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী এমন সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, ইহাতে যে দর্শকের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইবে, তাহা বিস্ময়কর নহে। বৃদ্ধ ইংরাজ এই চিত্রখানির প্রতি একাগ্রচিত্তে চাহিয়া কি এক গভীর চিন্তাতে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে বড়ই রুগ্ন ও দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি যেরূপ নিবিষ্টচিত্তে চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন এই চিত্রখানি তাঁহাকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। বহুক্ষণ তাঁহাকে এইরূপে নীরবে ও ঊর্দ্ধনয়নে চিত্রখানির সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা যুবতী অনুযোগসূচক স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বাবা! সন্ধ্যা

হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে এ স্থানে আমাদের আর অবস্থিতি করা উচিত নহে। এরূপ সময়ে বাটীর বাহির হওয়াই আমাদের অন্যায় হইয়াছে। কন্যার এইরূপ অনুযোগে বৃদ্ধ ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন—

"কি চমৎকার চিত্র! দর্শনযোগ্য বটে! ইহা দর্শন করিয়া আমার মনে হইতেছে যেন আমি এক্ষণে উত্তরমেরুপ্রদেশে অবস্থান করিতেছি। সে স্থানের হিমসিক্ত শীতল বায়ু যেন আমার ললাটদেশ স্পর্শ করিতেছে। সত্য সত্যই আবিষ্কারকের জীবনের ন্যায় উৎসাহ-উত্তেজনাপূর্ণ জীবন আর নাই।" বৃদ্ধের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিকটস্থ এক তরুণবয়স্ক শ্রমজীবী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—

"মহাশয় আপনি কি উত্তরমেরুপ্রদেশে কখন গমন করিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমি উত্তরমেরুপ্রদেশে কয়েকবার গমন করিয়াছিলাম।"

শ্রমজীবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়, মেরুসাগরের পরপারে কোন ভূভাগের অস্তিত্ব আছে কি না, বোধ হয় তাহাই আবিষ্কারার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"হাঁ, উত্তরমেরুপ্রদেশস্থিত সাগরের পরপারে কোন ভূভাগের অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা আবিষ্কারার্থ তথায় গমন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের উদ্দেশ্যও ছিল। যদি আমি ধনী হইতাম, তাহা হইলে স্বকীয় ব্যয়ে এক বৃহৎ জলযান তথায় প্রেরণ করিতাম।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ পুনরায় অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"কে জানে, হয়ত ভাগ্য আমাদের প্রতি অনুকূল হইবে। হয়ত আমরা বিপুল ধনলাভ করিব।"

শ্রমজীবী পুনরায় বলিল—"মহাশয়, আপনাকে নিশ্চয়ই এরূপ বিপদসঙ্কুল কঠিন কর্ম্মে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"হাঁ, মেরু-আবিষ্কার-কার্য্যের কষ্টেই আমার এরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।"

ইহাতে যুবা শ্রমজীবী উৎসাহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল—"এরূপে জীবন যাপন করা কি আনন্দের বিষয়?"

বৃদ্ধ মৃদু হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—"হাঁ, জীবজন্তুর আবাসপরিশূন্য, তুষারাবৃত এরূপ প্রদেশে জীবন যাপন করা কষ্টকর বটে। তথাপি ইহার মোহিনী শক্তি যথেষ্ট আছে। এখনও রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখিলে সেই নির্জ্জন দেশে গমন করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমার পিতা দেশ-আবিষ্কারক ছিলেন। আমার শৈশবাবস্থায় মারসি উপসাগরে ইন্‌ভেষ্টীগেটর নামক জাহাজে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।"

বৃদ্ধকে এইরূপ ভাবে কথোপকথনে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার কন্যা পুনরায় উদ্বেগ-

পূর্ণ স্বরে বলিল—"বাবা, আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইয়াছে। আসুন, বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। আপনার শরীরও আজ ভাল নাই। আর কল্য অতি প্রত্যূষে আমাকেও কার্য্যস্থলে যাইতে হইবে।"

বৃদ্ধকে বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কন্যাকে এরূপ ব্যগ্র দেখিয়া শ্রমজীবী অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"মহাশয়া, আপনার পিতার সহিত উত্তরমেরুবিষয়ক কথোপকথনে এরূপ বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমি যে ইঁহাকে এরূপে শ্রান্ত করিয়া তুলিতেছি, তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম।

শ্রমজীবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"শ্রান্ত! আমি শ্রান্ত হই নাই। শুনুন, উত্তরমেরুপ্রদেশের কোন ভূভাগ আবিষ্কার করা ব্যতীত সেই স্থানে গমনের আমার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। আমার জন্মের প্রমাণসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র আবিষ্কার করিবার জন্যও আমি সে স্থানে গমন করিয়াছিলাম। যদ্যপি আমি সে সমস্ত প্রাপ্ত হইতাম—"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিলে, বৃদ্ধের সমভিব্যাহারিণী যুবতী প্রতিবাদসূচক স্বরে বৃদ্ধকে বাধা দিয়া বলিল—"বাবা এক্ষণে নিবৃত্ত হউন।"

বৃদ্ধ যুবতীর এরূপ প্রতিবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন—"মারসী, চুপ কর।" তৎপরে পুনরায় শ্রমজীবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"শুনুন, যদি আমি আমার জন্মের প্রমাণসম্বন্ধীয় কাগজ পত্র প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে আমরা সম্পত্তিশালী হইতাম। সামান্য আয়ে আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইত না।"

বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া যুবতীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেননা তাহারই শ্রমোৎপন্ন সামান্য আয়েই উভয়ের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। সেই জন্য পিতার এই বাক্যে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। এই সময়ে যুবক শ্রমজীবী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং বৃদ্ধ রবার্ট মারভিল্ পুনরায় সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হাঁ, ইহা সমাধি! লোকে ইহাকে সমাধি বলিতে পারে সত্য; কিন্তু আমার নিকট ইহা আশা, যৌবন ও স্বাস্থ্যের সমাধি। নিষ্ঠুর হিমময় উত্তরমেরুপ্রদেশস্থ সাগর যতদিন না সেই গুপ্ততত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবে ততদিন সে তত্ত্ব লুক্কায়িতই থাকিবে।"

বৃদ্ধ এইরূপ অস্পষ্ট স্বরে আপনা আপনি কথা বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া ও এই সময়ে তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক অপার্থিব ভাব ব্যক্ত হইতেছিল দেখিয়া যুবতী সভয়ে পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"বাবা, আপনি ওরূপ ভাবে আর কথা বলিবেন না। আপনি কি বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইতে পারেন না? যাহা অপ্রাপ্য, তাহা পাইবার বাসনা পরিত্যাগ করুন।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"হাঁ, যথার্থই

অপ্রাপ্য বটে। কারণ আমি বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। সে সম্পত্তি পাইবার জন্য পুনরায় উত্তরমেরুপ্রদেশে গমন করিতে অক্ষম। মারসী, আমি এক্ষণে যথার্থই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আইস, এক্ষণে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। পরলোকে সুখের বিষয় এই হইবে যে, আমি আর সমুদ্রের আহ্বান শুনিতে পাইব না। কেননা, যখন আমি সমুদ্রের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করি, তখন আমি হিমশিলামগ্ন উত্তরমেরু-প্রদেশে গমন করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

বৃদ্ধ যখন এই কথাগুলি বলিলেন, তখন তাঁহার হাবভাবে বোধ হইল মৃত্যু যেন তাঁহার সন্নিকট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার একমাস পরে মারসী মারভিল লণ্ডন নগরীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত মাডাম লিস নাম্নী জনৈকা বস্ত্রবিক্রেত্রীর বিপণিতে জনৈকা ধনশালিনী ক্রেত্রীকে নানাবিধ রেশমী বস্ত্র দেখাইতেছিল। মারসী সেদিন অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। সেদিন মাডাম লিস উপরি-উক্তা ক্রেত্রীকে প্রীত করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য তিনি মারসীর অসুস্থতা-জনিত অবসন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কঠোরস্বরে বলিলেন,—"দেখুন, মিস মারভিল, আজ আপনার ওরূপ অবসন্ন ভাবে থাকিলে চলিবে না, প্রফুল্লচিত্তে নিজ কার্য্য সম্পাদন করুন।"

মারসী বহুদিন হইতে মাডাম লিসের দোকানে সহকারিণীর কার্য্য করিতেছিল। মাডাম লিসের এইরূপ কঠোর স্বরে তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাডাম লিসের অস্বকার এই সম্পত্তিশালিনী ক্রেত্রী আমেরিকার সিকাগো নগরের একজন ক্রোরপতির কন্যা, নাম মিস স্মিথ। ইনি বিবাহের পরিচ্ছদ ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভাবী পতির সহিত আগমন করিয়াছিলেন। মিস স্মিথের ভাবী পতি লর্ড মারভিল দোকানে দোকানে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ার্থ বিচরণ করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি কেবলমাত্র তাঁহার ভাবি-পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ তাঁহার সমভিব্যাবহারী হইয়াছিলেন।

মারসী যখন নির্ব্বাচনের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে নানাবিধ বস্ত্র ও পরিচ্ছদ সংস্থাপন করিতেছিল, তখন লর্ড মারভিল বিক্রেয় বস্ত্রসমূহের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান না করিয়া মারসীকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। মনোহর ভায়লেট বর্ণের নয়নযুগল, ঈষৎ রক্তিমাভা গণ্ডস্থল এবং ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশিযুক্তা এই সুন্দরী বালিকা লর্ড মারভিলের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছিল। মারসীকে সে সময়ে অত্যন্ত শ্রান্ত ও অবসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে দিন সে কোন প্রকারে তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছিল। লর্ড মারভিল তাহাকে এইরূপ

পীড়িত দেখিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্র হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"কি অত্যাচার! পীড়িতবালিকাকে এইরূপে অনর্থক কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। অ্যালোইসের অঙ্গকার পরিচ্ছদক্রয় কার্য্য শীঘ্র শেষ করা উচিত। অ্যালোইসের দয়া নাই। সে এক এক খণ্ড বস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রায় তিন চারি বার করিয়া পরীক্ষা করিতেছে কেন, সে কি একবারেই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে না?"

তৎপরে লর্ড মারভিল উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"প্রিয় অ্যালোইস, এই পরিচ্ছদটি ক্রয় করিতেছ না কেন? ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। অন্ততঃ আমাকে প্রীত করিবার জন্য ইহা ক্রয় করিয়া লও।"

অ্যালোইস্ উত্তর করিল,—"হাঁ, ষ্টিফেন, ঠিক বলিয়াছ। আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

অতঃপর মাডাম্ লিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অ্যালোইস্ বলিল—"মহাশয়া, আমি এই পরিচ্ছদটি ক্রয় করিব; এতদ্ব্যতীত একটি সান্ধ্য পরিচ্ছদও ক্রয় করিতে চাহি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে দেখান।"

লর্ড মারভিল অ্যালোইসের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"অ্যালোইস্! আজ যথেষ্ট হইয়াছে। সান্ধ্য পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া ত সহজ ব্যাপার নহে।"

অ্যালোইস উত্তর করিল—"সহজ ব্যাপার নহে সত্য। কিন্তু তাহাতে বেশ আমোদ হইবে।" (মারসীর প্রতি) "যাও ভাল দেখিয়া একটি সান্ধ্য পরিচ্ছদ লইয়া আইস।"

লর্ড মারভিল মারসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।" মারসীর প্রতি লর্ড মারভিলের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া মাডাম্ লিস অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। লর্ড মারভিল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আপনার এই সহকারিণীকে অত্যন্ত শ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহাঁর পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকে কি আপনি অন্য নিযুক্ত করিতে পারেন না?"

লর্ড মারভিলকে মারসীর প্রতি এইরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়া অ্যালোইস বলিল—"ষ্টিফেন্স, তোমার এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। এই শ্রেণীর লোক আমাদের ন্যায় সহজে শ্রান্ত হয় না। ইহারা এরূপ কাজে অভ্যস্ত। বিশেষতঃ আমি এই পরিচ্ছদটি ক্রয় করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছি।"

গৃহে রোগীর সেবা।

বাড়ীতে কেহ পীড়িত হইয়াছেন, আর তাঁহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত সমস্ত সংসারে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থা মধ্যে মধ্যে সকল পরিবারেই ঘটিয়া থাকে। এই প্রকার বিপদের সময়েই মানুষের চরিত্র স্পষ্ট বুঝা যায়। মনে মনে পরসেবা ও মুখে শুশ্রূষার কথা বলিয়া সম্পৎকালে সময় কাটাইতে অনেকেই সক্ষম, কিন্তু কঠিন পীড়ার সময় স্থিরচিত্তে ও ধীরভাবে রোগীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করা কেবল আন্তরিক ও শারীরিক বলশালী লোকদিগেরই কাজ। কোন ভয়ানক পীড়ার সময় ১১।১২ বৎসরের বালিকার উপর রোগীর বা তাহার শুশ্রূষার সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা যায় না বটে কিন্তু সে অনায়াসে রোগীর সেবায় মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীদের সাহায্য করিতে পারে। এই গুরুতর কার্য্যে তাহার যাহা কিছু ক্লেশ বা ক্লান্তি হইবে, তাহা সে আত্মীয় স্বজনের প্রেম ও যত্নে ভুলিয়া যাইবে। আর ঐ সৎসাধনা দ্বারা অল্প বয়স হইতেই সে আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হইবে।

বালিকাদিগের পক্ষে রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে সহায়তা করা আপাততঃ সহজ বোধ হয়; কিন্তু উহাতেও বাস্তবিক জ্ঞানের আবশ্যক। যে বালিকার তদুপযুক্ত জ্ঞানটুকু হইয়াছে, সে বিনা উপদেশেও রোগীর সেবায় মাতা বা অন্য শুশ্রূষা-কারিণীর যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু যাহার সে জ্ঞানটুকু হয় নাই, সে সেবা করিতে হাজার উৎসুক ও সহৃদয় হইলেও এ কাজে সাহায্যের পরিবর্ত্তে কেবল বিঘ্নের কারণ হয়।

পরের জন্য সমবেদনা, উদ্বেগ ও দুঃখ কাহাকে কাজে উত্তেজিত করিলে তাহা অতি উত্তম হৃদ্বৃত্তির পরিচয় দেয়; কিন্তু ঐ ভাবগুলি যদি মনে উদয় হইয়া কেবল কল্পনাতেই সংবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সে গুলি সঙ্কটকালে কোন কাজের হয় না। মনে দুঃখ হইলেও তদ্বারা অভিভূত না হইয়া যিনি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে সক্ষম হন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিনী সেবিকা হইতে পারেন। আর যে স্ত্রীলোক দুঃখচিন্তায় অভিভূত হইয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়, রোগীর গৃহে না আসাই তাহার পক্ষে ভাল। কেননা, তাহার কাতরতা দেখিলে পীড়িত ব্যক্তি নিঃসন্দেহই অধিকতর অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

রোগীর সেবার সময় উহাতে সমস্ত মনপ্রাণ দেওয়াই কর্ত্তব্য; নতুবা সেবিকা নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকিলে একমনে রোগীর পরিচর্য্যা করা তাহার পক্ষে

অসম্ভব। পীড়ার সময় রোগীকে ঔষধ ও পথ্যদান, শারীরিক কষ্ট নিবারণ, এ সকল কাজ পরিচারিকার উপর একান্ত নির্ভর করে; সুতরাং রোগীর ভাবগতিক দর্শনে যে সময়ে যাহার অভাব হয়, তাহা বুঝিয়া রোগীর তত্ত্বাবধান করা সেবিকার প্রধান কাজ। অনেকে মনে করেন, অসুস্থ লোকের নিকট বসিয়া পাখা নাড়িলেই রোগীর সেবা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে বালিকা পরিবারের কোন পীড়িত লোকের সেবা করিতে ইচ্ছুক, ডাক্তারের উপদেশ, ঔষধ ও পথ্য দিবার সময় ও রীতি উত্তমরূপে বুঝা তাহার প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পর রোগীর যখন যাহা আবশ্যক তাহা বুঝিয়া তাহাকে সর্ব্বদা শান্ত, প্রফুল্ল ও আরামে রাখিলে তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা, এবং ঐ বিষয়ে দক্ষ হওয়াও সেবিকার প্রধান কর্ত্তব্য। অবশ্য রোগবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার আবশ্যক, অতএব এখানে সে বিষয়ে উপদেশ দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা সকল সেবিকারই মনে রাখা উচিত।

১ম। রোগীর গৃহে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে ও পরিষ্কার হস্তে থাকিবে ও অতি আস্তে আস্তে চলিবে ও কথা কহিবে।

২য়। রোগীকে বিনা খাদ্যে অনেকক্ষণ রাখিবে না। আর ডাক্তার যে পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা প্রস্তুত হইলে, উহা রোগীর সেবনের উপযুক্ত হইয়াছে কিনা বিশেষ করিয়া দেখিবে। রোগীকে একেবারে অধিক আহার দেওয়া উচিত নহে; কারণ পীড়াকালে লোকে শিশুর ন্যায় হয়, এককালে অধিক খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না। খাদ্যসামগ্রী কখনও রোগীর গৃহে রাখা উচিত নহে।

৩য়। রোগীর ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্য সর্ব্বদা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিপাটী রাখিবে।

৪র্থ। বার বার রোগীকে ঔষধ খাইবার সময় বলিয়া বিরক্ত করিবে না, বা তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে না। রোগীর বিছানার উপর বসিবে না, বা কোন দ্রব্য উহার উপর রাখিবে না।

৫ম। বায়ুচালনা দ্বারা রোগীর গৃহের বায়ু সতত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ রাখিবে। গৃহে এককালে একজনের অধিক লোক, বা শিশুদিগকে যাইতে দিবে না। রোগীর ঘরে আতর, ওডিকলোন ইত্যাদি গন্ধ রাখিবে না; তবে মাঝে মাঝে একটু গোলাপজল ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়।

৬ষ্ঠ। মধ্যে মধ্যে গরম জল দিয়া রোগীর হাত মুখ মুছিয়া দেওয়া ভাল।

৭ম। রোগীর গৃহে বা উহার নিকটে কখন কাণে কাণে কথা কহিবে না, উহাতে রোগীর ভয় হইবার সম্ভাবনা। আর ঘরের নিকটে যাহাতে অতিরিক্ত শব্দ ও হাসির রোল না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবে।

৮ম। রোগীর পক্ষে অপকারী না

হইলে, যতদূর পার তাহার ইচ্ছামত কাজ করিবে।

অনেকে এই সকল সতর্কতা অতি সামান্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু ঐ সকল স্মরণ রাখিয়া না চলিলে কখন উৎকৃষ্ট ও পারদর্শিনী সেবিকা হওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই সকল সামান্য বিষয়ে অবহেলা করিলে অনেক সময় রোগীর যে কত ক্লেশ বৃদ্ধি হয়, তাহা অভিজ্ঞ সেবিকামাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন। আর ঐ সকল সামান্য সামান্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়াই শুশ্রূষাকারিণীর প্রধান কাজ, কেননা উহা ব্যতীত প্রকৃত পরিচর্য্যা করা এক প্রকার অসাধ্য। এ সকল কাজ বালিকাদিগের সাধ্যাতীত, এরূপ যেন কেহ না ভাবেন; কারণ আমি স্বচক্ষে দুই তিনটী ১১।১২ বৎসরের বালিকাকে একমনে রোগীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছি। যে কাজ একজনের সাধ্যায়ত্ত, তাহা করিবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই অন্য লোকেরও আছে। "অসাধ্য" কথা এ সংসারে কেবল অলস লোকদিগকেই বলিতে শুনা যায়।

রোগীর সাধারণ সেবার জ্ঞান ব্যতীত যে সকল পীড়া সচরাচর হইয়া থাকে, তাহার ঔষধ জানাও অতি আবশ্যক। এ বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে অনেক সময় আত্মীয়দিগকে আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা করা যায়। আজকাল সরল চিকিৎসা-বিষয়ক অনেক পুস্তক হইয়াছে, সেজন্য আমি আর এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিলাম না। সামান্য পীড়ায় হোমিওপ্যাথিক মতে "গৃহচিকিৎসা" অতি উপকারী পুস্তক। ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া গৃহিণী মোটামুটী ব্যবস্থাগুলি মনে রাখিলে তাঁহার সংসারের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। আর বালকবালিকারাও তাহা পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান হইতে শিখিবে।

নূতন সংবাদ।

আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতসম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীনগরে এক দরবার হইবে। এই দরবারের কার্য্যের সুবিধার জন্য গোয়ালিয়রের মহারাজা দ্রব্যাদি বহন করিবার ট্রেণ ও ৪ খানা মোটর গাড়ী দরবার কমিটির হস্তে প্রদান করিয়াছেন। দরবারের শোভাবর্দ্ধনের জন্য তিনি একটী কৃত্রিম ঝরণাও প্রদান করিবেন। তেহারীর রাজাও তাঁহার সৈন্যদল প্রদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রগণের তত্ত্বাবধানের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, শুনা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয় তাহার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া বিলাত গমন করিয়াছেন।

আলিপুর পশুশালায় একটা সিন্ধুঘোটক আছে। সেই সিন্ধুঘোটক সম্প্রতি হঠাৎ ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার পালকের পেট দন্তদ্বারা চিরিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে পালকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শুনা যাইতেছে, কলিকাতার মিউনিসিপালিটী রাজা ও রাণীর অভ্যর্থনার জন্য ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

আগামী এপ্রেল মাস হইতে নূতন ধরণের মণিঅর্ডারের ফরম্ প্রকাশিত হইতেছে, এবং ইচ্ছা করিলেই আর মণিঅর্ডার ফরম পাওয়া যাইবে না। এপ্রেল মাস হইতে এক আনা মূল্যে ফরম বিক্রয় হইবে। পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইতে ফি দিতে হইবে না। এই নূতন নিয়মে পোষ্ট অফিসের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহা কিরূপ সুবিধাজনক হইবে, বলা যায় না।

কাশিমবাজারের মহারাজা বাহাদুর ও দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুর কলিকাতা স্ত্রী-হাসপাতালে ২০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাডুয়েট সভ্যগণ পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পুরুষ গ্রাডুয়েট সভ্যগণই সমস্ত ভোট দিয়া থাকেন, কিন্তু উপাধিপ্রাপ্ত নারীগণের ভোট দিবার অধিকার নাই। শুনা যাইতেছে, নারীজাতির প্রতি এইরূপ অবিচারের প্রতিবাদ করিয়া সার ফিলিপ ম্যাগেনাস্ এম, পি, প্রমুখ ১৮০০ জন পুরুষ সভ্য বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদনকারীদিগের মধ্যে ইংলণ্ডের অনেক খ্যাতনামা লোক আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয়ও ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

বামারচনা।

ভালবাসি।

(১)

বড় ভালবাসি আমি
সোণামুখী সাঁঝে,
জোৎস্না উছলি পড়ে
অনিল মূরছি ঝরে,
কি যেন গাহিয়া যায় মরমের মাঝে।

(২)

বড় ভালবাসি আমি
সোণামুখী সাঁঝে
পরিয়া বিচিত্র চেলি,
লাজুক নয়ন তুলি,
অনিমিষে ধরাপানে যেন চেয়ে আছে।

(৩)

আননে চন্দ্রমা হাসে,
মরি কি শোভনা!
প্রেমের নিঝরে ঝরে
সে যেন চুইয়া পড়ে
লুটায়ে পড়িছে দিব্য গোলাপী ওড়না।

(৪)

ভালবাসি আমি অয়ি
সোণামুখী মেয়ে,
পরের সুখের লাগি,
সতত আপনা ত্যাগী,
ধরণী জুড়ায় যবে দিবা যায় বয়ে।

(৫)

শীতল বাতাস বহে,
পুলকিত কায়,
বিহগ খুলিয়া প্রাণ,
গাহে সুললিত গান,
প্রকৃতি বাজায় বীণা, বিশ্ব মুগ্ধ তায়।

(৬)

ভালবাসি আমি অয়ি
শান্ত নিশিথিনি!
নাহি দুঃখ, নাহি জ্বালা,
পরার্থে পরাণ খোলা
কি সুন্দর ভাবময়ী পূর্ণিমা যামিনী।

(৭)

ডুবে যেতে তার মাঝে
সাধ যায় মোর,
ওরূপ তরঙ্গপরে
ভেসে যাই চির তরে,
কুসুম পীযূষমাঝে যেমন ভ্রমর।

(৮)

সুখময়ী সন্ধ্যারাণী,
কিবা মনোহর!
বসিয়া সবুজমাঝে
চেয়ে দেখি নীলাকাশে,
হাসিছে সাঁঝের কোলে শশাঙ্ক সুন্দর।

(৯)

তাই ভালবাসি আমি
সোণামুখী সাঁঝে
দিবসের ঝালাপালা
শান্ত হয় এই বেলা,
কি সুখ বহিয়া যায় মরমের মাঝে।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়, নিলকামারী।

বিশ্বাসের জয়।

বাপ মা নাই ফুলের মতন
দুটী মাত্র ভাই বোন;
ফুলের মত নরম স্বভাব,
ফুলের মতন মন।

বোনটী সবে দশ বছরের,
ভাইটী বছর সাত,
একটি চা'ল ঘরে নাই,
শূন্য তাদের হাত।

এখন তারা হেসে খেলে
সময় কাটাবে,
কি বুঝে তারা, কি বা করিয়ে
সংসার চালাবে?

একদিন ক্ষুধায় অধীর হ'য়ে
ভাইটী বলিল "দিদি!
আজকে ক্ষুধায় মারা যাই,
খেতে না দিস্ যদি।"

"ঘরে নাই এক গোটা ধান
কি হবে ভাই! বল্"
ভাই বোনের চোখ দিয়ে
পড়ে অশ্রুজল।

হঠাৎ বোনটী বলিল "ভাই!
মনে পড়েছে রে,
একটি কথা মা আমাদের
বলে গেছেন রে।

"যতই দুঃখ, যতই ক্লেশ,
পাওনা কেন তুমি,
সকলি ঘুচাতে পারেন
জগতের স্বামী।

"জা'নালে তাঁহারে সব
ব্যথা দূরে যায়,
তাইতো ভক্তেরা সব
বলেন তাঁর পায়।

"আজ আমাদের দুঃখের কথা
বলিগে তাঁর কাছে,
নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাব
করুণাময়-সাজে।"

এই না বলে বোনটী লেখে
চিঠি একখানি,
"না খেতে পেয়ে মরে যাই,
জগতের স্বামী!

"মা বলেছেন তোমার কাছে
বল্লে দুঃখ ঘুচে,
তাই এসেছি দু' ভাই বোন
দাও দুঃখ মুছে।"

চিঠি লিখে শিরোণামা তার
ভাবিছে কি দিবে,
ভাইটী বলে শুধু "ঈশ্বর"
লিখিলেই হবে।

"ঈশ্বর" শিরোণামা লিখে
দু' ভাই বোন ছুটে,
ডাকঘরে পাল্লে দিতে
সকল দুঃখ টুটে।

হেনকালে সদাশয়
ভদ্র একজন
দেখেন গলাগলি ধরা
দুইটী ভাই বোন।

বোনের হাতে বাঁকা লেখা
লিপি একখান,
"ঈশ্বর" তার শিরোণামা
একি সরল প্রাণ!

বল্লেন তিনি "একটি বোঁটায়
দুইটী কমল ফুল
কারে যাচ্ছ দিতে চিঠি
কি কর্‌ছ ভুল?"

তারা বলে "মা বলেছেন
দুঃখ কষ্ট পেলে,
বোলো সব তাঁহারই
চরণের তলে।

তাই মেয়া চিঠি লিখেছি।"
বাবু বল্লে "খুকি!
বেশ তোমাদের মনের ভাব,
হবে তোমরা সুখী।

ভাবিয়াছি ঈশ্বরের কাছে
আমি আজকেই যাব,
দাও আমাকে চিঠিখানা
তাঁহাকেই দিব।"

সদাই বাবু অন্তরালে
তাদের খবর নিতেন,
যখন যা' অভাব দেখ্‌তেন,
অম্নি পুরিয়ে দিতেন।

ফুলের মতন ভাই বোন দুটী,
সদাই হাসিমুখ,
ঈশ্বর সব অভাব ঘুচান
কেমন সরল বুক।

শ্রীযুক্তা সুরুচিবালা সেন।

জিজ্ঞাসা।

ছিঁড়ে যাক এ বীণার তার,
স্তব্ধ হোক্ কাকলি লহরী,
অন্ধকারে ডুবে যাক্ ধরা,
আমার কি ক্ষতি তায় হরি!

আমি কেন তোমারে ভুলিয়া
দুঃখময় আবর্জ্জনা আনি,
সংসারের কোলাহলমাঝে
মন নিয়ে করি টানাটানি।

বল প্রভো! বল দয়াময়!
ভ্রান্তি মম ঘুচিবে গো কবে?
দূরে যাবে মোহ প্রহেলিকা
পুণ্যস্রোত হৃদয়ে বহিবে?

শ্রীযুক্তা প্রিয়বালা রায়, দ্বারভাঙ্গা।

২৯।০ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 571. March, 1911.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৮ বর্ষ। ৫৭১ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩১৭। মার্চ্চ, ১৯১১। } ৯ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসব—আগামী জুন মাসে ইংলণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইবে। ২২শে জুন তদুপলক্ষে শোভাযাত্রা হইবে। তৎপর দিন রাজা স্বয়ং রাজপথে বহির্গত হইয়া সকলকে দর্শন দিবেন। এই শোভাযাত্রা দর্শন জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই সকল আসনে বসিবার নিমিত্ত কয়েকখানা টিকিট ইণ্ডিয়া অফিসের হস্তে দেওয়া হইবে। এই সকল টিকিট ভারতবর্ষের অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান্ ও ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতবাসিগণকে দেওয়া হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। দর্শকদিগকে ৭॥০ টাকা মূল্য দিয়া এক এক খানি টিকিট ক্রয় করিতে হইবে। আমরা বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি সম্রাটের এই শুভ অভিষেক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করুন।

সম্রাটের সহৃদয়তা—সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ আগামী ৩০শে জুন ক্রিষ্টাল প্রাসাদে লণ্ডনের এক লক্ষ বালিকাকে ভোজ দিবেন।

ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলন—আগামী ২রা ও ৩রা বৈশাখ ময়মনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এই সম্মিলনে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ—গত ২রা মার্চ্চ রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে কাণ্টারবারি ইয়র্কের কনভোকেসন হাউস হইতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। তদুত্তরে রাজা বলিয়াছেন—"আমি যে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছি এবং পরে যে ভারতবর্ষে গমন করিব, ইহাতে দূরবর্ত্তী ও নিকটস্থ ব্রিটিশ প্রজাপুঞ্জের উপর আমার ভালবাসা আছে, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে

যাহারা ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকিয়া শান্তি ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে, তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরক্ত হইবে এবং ব্রিটিশ গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবে।"

কাশ্মীর প্রদেশে গোহত্যা নিবারণ—কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহার রাজ্যমধ্যে গোবধ-নিবারণের নিমিত্ত এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ গোমাংস আনয়ন করিতে পারিবে না। ইহাতে ইউরোপীয় ও অন্যান্য অনেক লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে।

মহিলা সভা—ফাল্গুন মাসের প্রথমে হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় তথাকার জমিদার ৺নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ঠাকুরবাটীতে অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় প্রায় শতাধিক ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পত্নী লীলাবতী মিত্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী কুমুদিনী মিত্র অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগের মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। একটি সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কুমারী কুমুদিনী মিত্র ও কুমারী বাসন্তী মিত্র সঙ্গীত করেন। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র প্রার্থনা করিয়া নিজের বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল।

সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ব্রতকথা।

(৩৬৮ সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর।)

প্রাচীন কালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে প্রবলপ্রতাপ পরমধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অনপত্যতানিবন্ধন বিষণ্ণমনে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন যে, রাজ্য, ধন, জন প্রভৃতি সমস্তই আমাদের সুখজনক বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল সন্তানের অভাবে সেই সমস্ত সুখদ দ্রব্যই আমাদের দুঃখের কারণ হইয়াছে। কোন বস্তুই আমাদের আনন্দজনক হইতেছে না।

নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত উন্মনা ও উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং বিষয়-ভোগ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রি-হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সস্ত্রীক অবিচলিত ভক্তি সহকারে তীর্থ পর্য্যটন, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে ও দৈবানুষ্ঠানে অনুরক্ত হইয়া সংযতচিত্তে ও কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সাবিত্রী দেবীর পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রাজা ও রাজমহিষী সহস্রসূর্য্যসমপ্রভা সেই সাবিত্রী দেবীকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলেন।

সাবিত্রী দেবী নৃপসমীপে অধিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় অলৌকিক তেজঃপুঞ্জে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিলেন। পরে তিনি প্রসন্না হইয়া সহাস্যবদনে নরনাথ অশ্বপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"মহারাজ! আমি তোমার ও তোমার পত্নীর অভীষ্ট পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিব, তোমরা আর কোন চিন্তা করিও না। তোমার সাধ্বী ভার্য্যা একটী কন্যা এবং তুমি একটী পুত্রসন্তান কামনা করিয়াছ; তোমাদিগের অভিলাষ অচিরাৎ পূর্ণ হইবে।"

মহাদেবী সাবিত্রী রাজাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে রাজা ও রাজ্ঞী গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে, রাজমহিষীর গর্ভ-লক্ষণ দৃষ্ট হইল। মহারাজ অশ্বপতি বৃদ্ধ-বয়সে সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া ইহজন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন ভাবিয়া, মনে মনে অনুপম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। গর্ভাবস্থায় সামান্য কারণে নানারূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা, এইজন্য রাজা অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধিকাংশ সময় রাজমহিষীর চিত্তবিনোদনার্থ তৎ-সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। এইরূপে দশ মাস দশ দিন অতীত হইলে, রাজ্ঞী শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে অলৌকিকরূপ-লাবণ্যসম্পন্না এক কন্যা প্রসব করিলেন।

সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিয়া এই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইজন্য গুরুজনের অভিমতে রাজ্ঞী কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন।

রাজকন্যা সাবিত্রী শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিতা হইয়া কালক্রমে রূপ-যৌবন-সম্পন্না হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতামাতার যত্নে বিদ্যাবতী ও গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন।

রাজা স্বীয় কন্যার যৌবনকাল সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার মানসে পাত্র অন্বেষণার্থ দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দূতগণ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও সাবিত্রীর অনুরূপ পাত্র লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা সকলেই নৃপতির সমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, —"মহারাজ! আমরা নানা স্থানে পরি-ভ্রমণ ও পাত্রের অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু রূপে গুণে সাবিত্রীর অনুরূপ পাত্র না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি।"

মনোমত পাত্র না পাওয়াতে পাছে সাবিত্রীকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে হয়, এজন্য রাজা সাবিত্রীকে পতি অন্বেষণ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎসে! তুমি স্বয়ং যে পতি মনোনীত করিবে আমি তোমাকে তাঁহারই হস্তে সম্প্রদান করিব।"

সাবিত্রী পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণামপূর্ব্বক

তাঁহাকে পিতার আদেশ জানাইয়া কহিলেন, "আমি পিতার উদ্দেশ্য সফল করিতে যত্নবতী হইয়াছি।" সাবিত্রীর এইরূপ সরল ও বিনীত বাক্যে পরম আহ্লাদিত হইয়া রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহার অনুমোদন করিলেন, এবং কুলদেবতাগণের নিকট কন্যার কল্যাণ কামনা করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী এইরূপে মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও আপনার প্রিয়সহচরীগণ সমভিব্যাহারে তিনি রথে আরোহণপূর্ব্বক তীর্থভ্রমণছলে তপোবনে গমন করিলেন। তথায় তিনি আশ্রমবাসী মুনিঋষিগণের চরণবন্দনানন্তর তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, আশ্রমবাসিনী মুনিকন্যাদিগের সহবাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যাগণও সাবিত্রীর সদ্‌গুণে ও শিষ্টাচারে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। মুনি ও মুনিপত্নীগণও সাবিত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সন্তাননির্ব্বিশেষে দেখিতে লাগিলেন।

এইরূপে সিদ্ধাশ্রমে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, একদিন প্রিয়সহচরী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সাবিত্রী দেখিতে পাইলেন, একটী বৃক্ষের মূলদেশে কুটীরাভ্যন্তরে জটাবল্কলধারী নেত্রহীন অশীতিপরবয়স্ক এক বৃদ্ধ, তদীয় বৃদ্ধা নারী, ও এক পরমরূপবান্ যুবা পুরুষ বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে সহসা দেখিয়া বনচারী তপস্বী ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ তপস্বীর অঙ্গাঙ্গুলিপ্ত ভস্মাভ্যন্তর হইতে শরীরের যেরূপ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল, তাহাতে স্পষ্টই অনুভূত হইল যেন কোন রাজ্যেশ্বর বয়োধর্ম্মানুসারে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যসুখে বীতস্পৃহ হইয়া, মনুষ্যজীবনের অমূল্য রত্ন ধর্ম্মধন লাভের জন্য, সুখদুঃখময় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, পারত্রিক অক্ষয় সুখলাভের বাসনায় সর্ব্বসুখদাতা দেবাদিদেবের আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে দর্শন করা অবধি সাবিত্রীর মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল। এজন্য তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও চিন্তাকুল হইলেন।

মুনিকন্যাগণ সাবিত্রীর এইরূপ বিষণ্ণতা দর্শনে তাহার কারণ অবগত হইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন। তাহাতে সাবিত্রী কহিলেন, "এই অরণ্যমধ্যে ঐ সরোবরতীরস্থ বৃক্ষমূলে এক মহাপুরুষ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে এক বৃদ্ধা স্ত্রী ও এক পরমরূপবান্ যুবা পুরুষ রহিয়াছেন। যুবা তাঁহাদিগের স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সেই আশ্রমেই প্রতিপালিত হইতেছেন। তাঁহার প্রতি দম্পতীর অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা ও বাৎসল্যভাব দেখিয়া ইহাকে তাঁহাদের পুত্র বলিয়াই অনুমান হয়। আহা! সেই তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষের যেমন স্বভাবসৌম্য কলেবর, তেমনি